মিঃ পাকড়াশী ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সমিতি

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রথম প্রতিভাস প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯১

প্রচ্ছদ : শুভাপ্রসন্ন

প্রতিভাস-এর পক্ষে বীজেশ সাহা কর্তৃক ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড,
কলকাতা-৭০০০০২ থেকে প্রকাশিত, সুকুমার দে কর্তৃক বাসন্তী প্রেস,
১৯/এ, ঘোষ লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

মিঃ পাকড়াশী

সুরের বিস্তারে আলাপ তখন জমে উঠেছে

নহ পুরুষ, নহ নারী, হে শিল্পী তুমি রূপের মধ্যে অরূপ
তুমি স্বর্গলোকবাসী অর্ধনারীশ্বর

চাঁদের মায়ের বিরুদ্ধে মিঃ পাকড়াশী আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করছে

কুষ্টির সাধনার চেষ্টা যে ক্ষেত্র বিশেষে হাস্যকর হতে পারে, অথবা সাধককে রোগাক্রান্ত করে ছাড়ে তা হয়তো অনেকেই জানেন না। রোগটা মারাত্মক ভাবে ছোঁয়াচে। এই কারণে রোগীকে সুস্থের কাছ থেকে পৃথক থাকতে হয়। রোগী পরোপকার ধর্মে ব্রতী হয়েছেন ভেবে শুধ আত্মতৃপ্তি লাভই করেন না, বিশিষ্ট রোগের বীজানুবাহক বলে আত্মশ্লাঘাকেও তোয়াজ করার সুবিধা পান।

মিঃ পাকড়াশী বেশ কিছুদিন ধরে কুষ্টি সাধনের রোগে ভুগছেন, এবং আত্মশ্লাঘার তোয়াজ করতে যাওয়ায় টিট্‌কারী দ্বারা জর্জরিত হয়ে পড়েছেন। এখন মিঃ পাকড়াশীর দিকে কেউ মনসংযোগসহ তাকালেই তিনি ভেবে নেন ঐ বাঁকা চাহনি শব্দহীন ভাষা অনেক অপ্রিয় কথা বলে ফেলেছে। মোট কথা রোগের সূত্রপাত মিঃ পাকড়াশীর কল্পনা থেকে, যা এখন এলার্জীতে দাঁড়িয়েছে

শোনা যায় চিকিৎসক কোন রোগের খোঁজ না পেলে এলার্জীর শরণাপন্ন হন। এলার্জীকেই না হয় একটা রহস্যপূর্ণ রোগ বলে ধরা গেল, কিন্তু কল্পনার ধাক্কা খাওয়া টিট্‌কারীকে তো রোখা গেল না। মিঃ পাকড়াশী নিরুপায় হয়েই অসহনীয়কেও সহ্য করতে লাগল, কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে! সীমার বেড়া ভাঙার জন্য পাড়ার ডেঁপো ছেলেরা উঠে পড়ে লেগে রইল। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তো হলই, তার সঙ্গে পাকড়াশীর পিতৃদত্ত নামটাও গোলমেলে করে ছাড়ল। এখন নাম্বার ওয়ান বললেই লোকে বুঝে নেয় সম্বোধনটি কার উপর প্রয়োগ করা হল। ওয়ানের গা ঘেঁষা শব্দটি আত্মগোপন করলে কি হয়, তেজীয়ান্ কৌতূহলের চাপে তদন্ত ফাঁস করে দেয় গোপনীয়কে। যে-মাত্র

গোটা নামটি দাঁড়ায় বোকা নাম্বার ওয়ান। যাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিঃ পাকড়াশী স্বনাম বর্জিত হলেন, তাদের এড়িয়ে চলারও উপায় নেই। ট্রাম বা বাস ধরতে হলে সেই ডাকসাইটে রোয়াকটার পাশ দিয়ে যেতে হয়, আর ঐখানেই তো বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো ডেঁপোর দল আছে। মিঃ পাকড়াশীকে কাছে আসতে দেখলেই একজনের গায়ে আর একজন ধাক্কা মেরে বলে, ঐরে, নাম্বার ওয়ান আসছে, হুঁশিয়ার, নইলে এইসান্ জ্ঞান দিয়ে দেবে যে প্যাঁচালো বুদ্ধি হজম করতে দেখবি নিজের আত্মা চোখের সামনে খাবি খাচ্ছে।

মিঃ পাকড়াশীর নামের নব সংস্করণ সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। নামকরণ অহেতুক নয়, কারণ সাধারণ মানুষ থেকে নিজেকে পৃথক প্রমাণ করার জন্য মিঃ পাকড়াশী সতেজ হয়ে থাকতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে প্রতিভা তাঁর তাঁবেদার গোলাম। এবং এই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর চলাফেরা ছিল বিশেষ ভঙ্গীতে এবং ভাবপ্রবণ কথোপকথনে থাক৩ কোটেসানের প্রাচুর্য। এমন কোটেসানের আশ্রয়ে তিনি আত্মরক্ষা করতেন যে, বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করতে অনেকে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ত, কারণ যে সব গ্রন্থ থেকে কোটেসানকে রক্ষাকবচের মত ব্যবহার করতেন তিনি, সেগুলির নামও কেউ শোনে নি। পরিচ্ছদে ছিল তাঁর ফ্যাশান মত্ততার পরম নিষ্ঠা। এবং আত্মশ্লাঘাকে জীইয়ে রাখার জন্য সবদাই কাছে রাখতেন দূরদর্শী চিন্তাশীলতা, যার জন্য যে কোন লোককে নিম্নস্তরের মানুষ ভাবতে তাঁর কোনই অসুবিধা হত না। এবং এই চিন্তার প্রকাশ হত কুঞ্চিত ভ্রূকে কপালস্পর্শী করে। তার সঙ্গে টোবাকো পাইপ কামড়ে থাকায় বিশেষ ভাবে মুখাকৃতির প্রদর্শনীর দ্বারা জানিয়ে দিতেন যে ছোটকে নীচে রাখার দাবী তাঁর আছে।

এই দাবীদারের বৈশিষ্ট সম্বন্ধে আরও খুলে বলা ভাল। গোড়াতেই চলাফেরার কথা বলি। অনেকেই দেখেছেন পথ চলতে

চলতে মিঃ পাকড়াশীর দৃষ্টি ঠিক জায়গায় উর্ধ্বমুখী হয়ে গিয়েছে। দ্রুতগামী মোটর গাড়ি এপাশ ওপাশ দিয়ে ছুটছে, কিন্তু মিঃ পাকড়াশী চাপা সড়তে নারাজ, তাঁর অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে বাছাই করা দোতলার বারান্দায় ঝোলায়মান সিক্ত শাড়ির ওপর। এবং যথাস্থানে শাড়ির মালিককে দেখতে না পাওয়ায় পরিচিত শাড়ির পাড়ই হৃদয় নিঃশেষিত দীর্ঘনিশ্বাস টেনে এনেছে। পরিচ্ছদের বৈশিষ্টে গুছিয়ে অগোছাল হওয়ার দৃষ্টান্তকে যে কোন নিরপেক্ষ বিচারক বলবে, অননুকরণীয়। মুখাবয়বেও দাড়ি-গোঁফকে এমনভাবেই ছাঁটা হয়েছে যে আলো-আঁধারীতে দেখলে মনে হয়, স্বর্গলোক থেকে মহাকবি সেক্ষীর মডার্ন হওয়ার জন্য মর্ত্যে নেমেছেন, কিন্তু স্পষ্ট আলোয় বোঝা যাবে ছাঁটাই করা দাড়ি একটি ছোঁয়াচে রোগের সিম্পটম। এক চোখে রিমলেস্ মনোক্ল চশমা তার ওপর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দাড়ি গোঁফের সঙ্গে গাঢ় খয়েরী রঙ সারা দেহে জড়িয়ে থাকায়, মিঃ পাকড়াশীকে বিলাতি মানুষ বলা না গেলেও পরিচ্ছদ এবং কেতরে ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ শুনে সন্দিগ্ধচিত্তে বিলেত-ফেরতার খ্যাতি দিয়ে দেওয়া যায়। এমন একটি মানুষের মুখে টোবাকো পাইপ লেগে না থাকলে কৃষ্টির কাণ্ডারী ভাবা যায় কেমন করে? সন্দেহাতীত হবার জন্যেই মিঃ পাকড়াশী বাইরে বার হলে সব সময় ধূমপানের চোঙা কামড়ে থাকেন। ফল ভালই পাওয়া যায়। কামড় খাওয়া বিলাতি শব্দের উচ্চারণকে সাহেবী বলা না গেলেও দো-আঁস্‌লা ভাবতে কোন অসুবিধা থাকে না।

বিলাতি কল্‌কে যে ভাবেই কামড়ান, তাতে আপত্তি ওঠার কথা নয়, কিন্তু দম্‌-মারা উচ্ছিষ্ট ধোঁয়াকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করতে গিয়েই মিঃ পাকড়াশী সেদিন দুর্যোগ টেনে আনলেন। ধোঁয়া ছাড়বি তো ছাড়, একেবারে সেই বারুদ ঠাসা ডাকসাইটে রোয়াকটার সামনে, এবং যার মুখের উপর কাণ্ডটি ঘটালেন সে হল রকবাজদের মার্কা মারা নেতা। সামনা সামনি লড়ে গেলে কোন দোষ না করলেও

লোকে যাকে বলে বসে,—কি চাস্? দিচ্ছি বাবা! বেশী মারিসনে। যে মানুষ না চাইতেই মন গড়া মারের পাওনা আদায় করতে পারে তারই মুখে মিঃ পাকড়াশী ছাড়লেন কিনা উচ্ছিষ্ট ধোঁয়া!

মিঃ পাকড়াশী যে কাণ্ডটা করে ফেললেন, তাতে নেতা ক্ষেপে উঠলে দোষ দেবার কিছু নেই। মিঃ পাকড়াশী উদ্‌গিরিত ধোঁয়া খাইয়ে নেতার জাতকে কলুষিত করলেন। জন্মগত জাত উঠে গেলে কি হয়, স্বোপার্জিত কর্মগত জাতকে মারে কে? এই নেতারও একটা স্বোপার্জিত জাত আছে, আর মিঃ পাকড়াশী তারই উপর জুলুম চালানোয় ফল ভাল হল না। নেতা চালাক লোক, গুলি চালানোয় ওস্তাদ, প্রকাশ্যে রাস্তার উপর গোল না করে ভবিষ্যতের জন্য পালটি-জবাব তুলে রাখল।

মার্জিত হওয়ার প্রয়োজনে সেদিন মিঃ পাকড়াশীর পাড়া ঘোরার কথা। ফিফি, সিসি, লিলি যে হোক একজনের বাড়িতে হানা দিতে হয়। দুই তিনটি উপাদেয় টাটকা স্ক্যাণ্ডাল সংগ্রহ হয়েছে, সেগুলির অচিরাৎ সদ্ব্যবহার দরকার, বাসি হলে কেচ্ছার তেজ উবে যেতে পারে। কাগজে বার হয়েছে লিলির বাড়িতে প্রফেসর এক্স আর্টের গূঢ়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবেন। আলোচনার ফাঁকে এক-আধটা কেচ্ছার খবর চালিয়ে দিলে, একটানা কালচারের আলোচনায় রসালো ব্রেক ভালই হবে।

মিস্ লিলি থাকেন আধা সাহেব পাড়ায়। বড় রাস্তার কাছেই ফুটপাতের গায়ে লাগোয়া বাড়ি। ফুটপাতের সামনে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা হাত তিনেক চওড়া জায়গা লনের অনুকরণে ঘাস দিয়ে ঢাকা হয়েছে। মিনি লন পার হলেই কয়েকটি সিঁড়ির ধাপ, তারপরই ড্রইরুমের দরজা। প্রাচীনপন্থীদের তুলনায় ভদ্রাচারের রীতি-নীতি লিলির সমাজে পৃথক, এই কারণে বাইরে থেকে ঘরের ভিতর আসতে হলে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজানো নিয়ম। ঘণ্টার অভাবে সাংকেতিক শব্দ দ্বারা আগন্তুককে প্রবেশাধিকার পেতে হয়।

মিঃ পাকড়াশী লিলির সঙ্গে কি ভাবে কথা আরম্ভ করবেন তারই চিন্তায় মশগুল হয়ে ছিলেন। ইন্টেলেকচুয়াল বাউট-এ পাঁয়তাড়াই তো প্যাঁচ মারার পথ দেখিয়ে দেয়। পথের সন্ধানে বিভোর হয়ে থাকায় মিঃ পাকড়াশী প্রত্যাশিত ভদ্রাচারে গলদ এনে ফেললেন। কোনরূপ সংকেত না দিয়েই ঘরে ঢুকে পড়ায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। ঢুকে যা দেখলেন, তা যেমন মনোরম, তেমনই মর্মান্তিক। মন মজানো দৃশ্যে দেখলেন উত্তেজক স্ক্যাণ্ডালের জাগ্রত রূপ, যে রূপ দেয় চিত্তে দোলা, মন উসখুস করে ওঠে স্ক্যাণ্ডালে ভাগ বসানোর জন্য। রহস্যপূর্ণ কালচারের আলোচনায় মিস লিলি প্রফেসরের কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়ে ক্রিয়েটিভ আর্টের সিক্রেট সম্বন্ধে কানে কানে এমন কিছু বলেছিলেন যা বোঝাতে হলে মৃদু ও নিস্তুল স্পর্শানুভূতির সঙ্গেও যোগ রাখতে হয়। ঘরে তখন আর কেউ ছিল না, তবু সিক্রেটকে দেহ দিয়ে আগলানোর প্রয়োজন থাকায় অনুমান করা চলে, আসন্ন রোমান্স ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

মিঃ পাকড়াশীর আকস্মিক আবির্ভাবে মিস লিলি অপ্রতিভ হলেও বেশ সংযত করে ঘনীভূতির মাঝখানে নির্মম বৈধ ব্যবধান এনে ফেললেন।

কালচার সংশ্লিষ্ট গভীরতম তত্ত্বের আলোচনায় মিঃ পাকড়াশী বিঘ্ন ঘটিয়েছেন বুঝতে পারায় অপ্রস্তুত ভাব দেখিয়ে বললেন, আপনাদের অসুবিধায় ফেললাম, কিছু মনে করবেন না।

একটা জলজ্যান্ত কেলেঙ্কারীকে খুন করার পরই যে মানুষ বলতে পারে, কিছু মনে করবেন না, সে একটি হৃদয়হীন ঘাতক। অপ্রত্যাশিত আচরণের বিরুদ্ধে প্রফেসর অভিযোগ তোলার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু মিস লিলি তাঁর মনোভাব বুঝতে পারায় বললেন, একটা আনওয়ারেন্টেড ইনট্রুশান হয়ে গেল, কি আর করা যায়। লোকটা একেবারে বাজে। সবে আমাদের সোসাইটিতে ঢুকেছে, স্মার্ট হতে সময় লাগবে। তবে চেষ্টার ত্রুটি

নেই, ওর টেনাসিটিকে তারিফ করতে হয়। যা খুশি বল না কেন, কিছুতেই রাগে না। ট্রেনিংটা সত্যি খুব সিরিয়াসলি নিয়েছে। ওকে সামহাউ চালিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু আর একদিকে ছাট বিলাত-ফেরতা যাকে ফেরতা যাকে পাঠিয়েছেন, সে নাকি গা নের ওস্তাদ। আহা, সে কি গান! না আছে কথা, না আছে মিষ্টি গলা। গানের মধ্যে কেবল সা রে মা গা ধা, তেরেনা তেরেনা। ঐ বীভৎস শব্দগুলো নাকি আলাপের অপরিহার্য আঙ্গিক। এ কোন্ দেশী সুরের আলাপ? যার মানে বোঝা যায় না এবং গান বাড়াবাড়ি হলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। সেদিন একটা আধুনিক গান গাইতে বলা হয়েছিল, সহজ বাংলা কথা দিয়ে গান। আমাদের রিকোয়েস্ট শুনে লোকটা এমন ভাবে তাকাল যাতে মনে হয় লোকটা যেন ফাঁসির হুকুমে মৃত্যুর মুখে চলেছে। ভেবে ছাখ, লোকটা কি রকম অবষ্টিনেট কিছুতেই গাইল না। অপর কি আমাদের সোসাইটির প্রধান কাজই হল প্রোগ্রোসিভ আইডিয়াকে এনকারেজ করা। ঐ রকম বিহেভিয়ার সত্ত্বেও লোকটাকে তাড়াবার উপায় নেই, কারণ স্বয়ং বিলাতফেরতা প্রেসিডেন্ট বাবু ঐ লোকটিকে রেকমেণ্ড করেছেন। আমাদের আবার প্রেসিডেন্টর কৃপা না হলে চলে না, আফটার অল তাঁরই পেট্রেনেজে আমাদের ক্লাব চলছে। এর পরেও কিছু বলার ছিল, কিন্তু দরজায় ঘণ্টা বাজায় অসমাপ্ত রয়ে গেল।

অর্দ্ধ উন্মীলিত দ্বারের পাশে যাকে দেখা গেল, তিনিও ভিন্ন প্রকারের বেওয়ারিশ, অর্থাৎ কিছুদিন হল দ্বিতীয়বার পতি বর্জনের পালা শেষ করে মেরী উইডোর যাবতীয় সুবিধা সংগ্রহ করেছেন। উপস্থিত পদবীহীন নামকেও স্বাবলম্বী করে ফেলায় ফিফি বলেই ক্লাবের সকলে তাঁকে চেনে।

ফিফির সমস্ত দেহ যখন নজরে এল তখন পূর্ণাঙ্গীর সৌষ্ঠবপূর্ণ গঠনশ্রী মিঃ পাকড়াশীর চিত্তে দোলা দিতে আরম্ভ করেছে। ফিফির সুচিন্তিত পরিচ্ছদের ব্যবহারে অপ্রয়োজনীয় ঢাকাঢাকির

বালাই ছিল না। উর্দ্ধাঙ্গ আবৃত করেছিল বুক-কাটা আঁটশাট নয়া ফ্যাশানের গেঞ্জী। আঁটশাট আবরণের চাপে ভেজালহীন পুষ্ট দেহাংশের বেশ খানিকটা বেরিয়ে এসেছে বাধাহীন ফাঁকা জায়গায়। অবর্ণনীয় দৃশ্য! এ যেন সংযম পরীক্ষার একটি অভিনব পন্থা। নিম্নাঙ্গে ছিল সাহেব খালাশীদের মত পাৎলুন। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত উর্দ্ধাঙ্গের মতই টাইট ছাঁটে কাটা। হাঁটুর পরে সবই ঢিলা। এদিকটা অবহেলার জন্য কে দায়ী বলা কঠিন। তবে দায়ী যেই হোক মিঃ পাকড়াশীর দৃষ্টি মনোমত আকর্ষণের স্থানেই আটকে পড়েছিল।

যারা চারিত্রিক আদর্শকে আগলাবার জন্য চকিত আড়চোখে দেখে নেবার চেষ্টা করেন, তাঁরা অনেক সময় শোনা গিয়েছে ট্যারা হয়ে যান। শুধু ট্যারাই হন না, সারটা জীবন বক্রদৃষ্টিকে চরিত্র ভ্রষ্টের প্রমাণ স্বরূপ মুখের উপর বহন করতে হয়। মোট কথা, ঢাকা দিয়ে খোলার প্রদর্শনীতে যে আকর্ষণ ছিল, তা মিঃ পাকড়াশীকে চুম্বকের মত টেনে নিয়ে গেল ফিফির কাছে।

মিঃ পাকড়াশী জলদি আলাপ জমানোর টেকনিক সংগ্রহ করেছিলেন অ্যাকাডেমির কোন একটা চিত্র প্রদর্শনীর ভীড়ে। সম্পূর্ণ অজানা মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে কি ভাবে নিজের পরিচয় আগে দিতে হয়, কি ভাবে আবহাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে গরম ঠাণ্ডার আলোচনায় নামতে হয় ইত্যাদি পরিচয়ের গোড়াপত্তনে নির্বিঘ্নে এগিয়ে যেতে পারলে স্বার্থের কথা পেড়ে ফেলায় কোনই অসুবিধা থাকে না। মিঃ পাকড়াশী আবহাওয়ার বার্তাবাহক হিসাবে কর্তব্যপালন ভালই করেছিলেন, কিন্তু স্বার্থের দিকে এগুতে যাওয়ার স্কিলফুল টেকনিকের ব্যবহারে গোল বাধালেন।

ব্যাপারটি এইরূপ। শীতের আমেজে তখন শরীরকে তাতিয়ে রাখার আয়োজন চলেছে। মিঃ পাকড়াশী আলাপের গোড়াতেই বেশ খানিকটা দরদ ঢেলে দিয়েছিলেন। দরদের কাজেও যে

বিষাক্ত গ্যাস উঠতে পারে তা মিঃ পাকড়াশী ভাবতেও পারেননি। দরদের কারণ ঘটল অঙ্গ-প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে। প্রসঙ্গক্রমে শীতের কথাতেই বলতে হল—বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই ভয় পাই নিমোনিয়ার এলাকায় অতখানি শরীর খোলা রাখলে একটা কিছু কাণ্ড ঘটে যেতে পারে।

মিঃ পাকড়াশীর দরদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হবার কিছু ছিল না, কিন্তু সন্দেহের কারণ এল দরদের পিছনে একটি ইঙ্গিত থাকায়। 'অতখানি খোলা শরীর' উক্তিটি শুনতে নীরস লাগলেও, তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করলে সন্দেহ থাকে না যে মিঃ পাকড়াশী নিজের অজ্ঞাতেই একটি রোমান্সের জাল বুনে ফেলছেন। জালের ফাঁদে কি ভাবে কাণ্ডটা গড়াবে এবং কি ভাবে ফিফি ফাঁদে আটকে পড়বেন, তা বুঝতে না পারলেও মিঃ পাকড়াশীর বেপরোয়া দৃষ্টি এবং ইঙ্গিতপূর্ণ উক্তিতে কাণ্ডটা যা দাঁড়াল তাতে ভালবাসার জমি তৈরি আর এই জমিতে ফসল ফলাতে দিলে ঐ লোকটার কাছ থেকে ভালবাসা অথবা সোজাসুজি বিবাহের প্রস্তাব আসতে কতক্ষণ? ফিফি সম্ভবপর ঘটনাটি মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করায় প্রায় আঁৎকে উঠলেন এবং আপন মনেই বলে ফেললেন হোয়াট্ এ শেম।

ফিফির এতটা উতলা হওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কারণ প্রস্তাব ছাঁটাইয়ের কাজে তিনি বিশেষ পারদর্শী ; এমন কি আইনসঙ্গত বিবাহের বাঁধন ছিঁড়ে মেরি উইডোর যাবতীয় সুবিধা সংগ্রহ করায় তিনি যে অব্যর্থ কৌশল দেখিয়েছেন তা বোদ্ধারা ফাইন আর্টের স্তরে তুলতে দ্বিমনা হননি। সুতরাং উপযুক্ত পাত্র হলেও যে তিনি সে প্রস্তাবকে আণ্ডার কনসিডারেশান ফাইলে পেণ্ডিং মার্কা করে দিতে পারেন তা অন্তত মিঃ পাকড়াশীর সম্ভবপর প্রস্তাব সম্বন্ধে বলা চলে। কিন্তু মানহানিকর মামলার জটিলতা যেখানে ফিফির অন্তর মন্থন করছিল, তাতে বেশীক্ষণ ভব্যতার সাংস্কারিক নীতি মানা গেল না। হঠাৎ ফিফি মিঃ পাকড়াশীর খুব কাছে এসে এমন

কতকগুলি কথা বললেন, যা একবার কানে গেলে দ্বিতীয়বার শোনার ইচ্ছা আসে না।

মিঃ পাকড়াশী নিজের ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টায় কিছু বলার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু ফিফি কঠোর দৃষ্টি দ্বারা যেভাবে বাধা দিয়েছিলেন তাতে হিংস্র বাঘ তেড়ে এলেও দাঁড়িয়ে যেত। মিঃ পাকড়াশী হতভম্বের মত দাঁড়িয়েই রইলেন।

ঘটনাটি সকলের কাছে বিস্ময়কর হয়ে উঠল। সপ্রশ্ন দৃষ্টির মাঝেই ফিফি মিস্ লিলির পাশে গিয়ে বসলেন। কৌতূহল উসখুস করছিল; কাছে বসতেই মিস লিলি বললেন, কি ব্যাপার, অত ঘেঁষাঘেঁষি? মান অভিমানের ডেমনস্ট্রেশান যে রকম দেখলাম তাতে মনে হয় অনেকটা এগিয়ে গিয়েছ। রিহার্সালের পালা ছেড়ে স্টেজে নামছ কবে? বল তো আমরা সকলে মিলে ওয়েডিং কেকের ফরমাস দিয়ে দি।

ঈঙ্গিতটির অনুভূতি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতই দাঁড়াল। ঘটনাকে লঘু করার জন্য ফিফি বললেন, সকলে শেয়ার করে যদি সেলেম্‌ন অ্যাক্ট সেরে ফেলতে চাও, তাহলে শেয়ারের ভাগ সম্বন্ধে হিসাবটা ঠিক হওয়া দরকার। এখন কথা হচ্ছে, সিংহ ভাগ নেবে কে?

মিস লিলি বাঁকা হাসিকে সামনে রেখেই উত্তর করলেন, ডার্লিং, ডোণ্ট বী ইমপেসেণ্ট, শেয়ারের ব্যাপারে আমরা হিসেবে ভুল করি না। অত স্পষ্ট ঘটনাকে প্রমাণ রেখে কি হিসাবে ভুল হবার জো আছে? সব কিছুই টু অবভিয়াস হয়ে গিয়েছে। এখন কাজের কথা বলি যিনি বড় পার্টনার তাঁরই সিংহ-ভাগ পাওয়া উচিত, অতএব মিঃ পাকড়াশীর মত নেওয়া হোক।

এতটা বলার পর লিলি দেখলেন, মিঃ পাকড়াশী পাথরে গড়া মূর্তির মত অটল ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মন যেন প্রেমের মোহন শক্তির দ্বারা আটক পড়েছে। ফিফির দিকে তাকিয়ে লিলি বললেন, অবস্থা যে কাহিল। শেয়ারের হিসাবে মিঃ পাকড়াশীর

ভাগ যে আর কেউ দাবী করবেন না, তা ভাই জানিয়ে এস। যা বুঝছি, লোকটা নিতান্ত, কি বলে···ভাল মানুষ। কম্পিটিশানের দাঙ্গায় ওঁর নামবার ক্ষমতা নেই।

প্রফেসর সুবিধা পেয়ে জানালেন, এসব ব্যাপারে লোকে ভাল মানুষকে বলে বোকা। এ বিষয়ে প্রশ্নের ফাঁক নেই।

হাত বদলের যে সব ঘটনাই ঘটে থাকুক ফিফির হৃদয়ে যে করুণা নেই এমন কথা বলা চলে না। কতকগুলি কটূক্তির পরই মিঃ পাকড়াশীর এই অবস্থার জন্য তিনি নিজেই দায়ী ভেবে ভদ্রলোককে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে গেলেন। অটল মূর্ত্তির কাছে তো গেলেনই, তার উপর ভদ্রলোকের হাত ধরে নিজের পাশে সোফাতে বসাতেই ঘরের ভিতর বিবাহোৎসবের অভিনয় শুরু হয়ে গেল। লিলি শাঁখের অনুকরণে হাত মুঠো করে দিলেন ফুঁ। প্রফেসর চক্ষু মুদ্রিত করে প্রচারকের অনুকরণে বর-কনেকে অঙ্গীকারবদ্ধ করার জন্য অদেশ করলেন—বল, তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক। হৃদয়ের টানাপোড়েনে ফিফি রীতিমত বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, হাইলি অবজেকশনাব্‌ল্‌।

মোট কথা বিবাহ উৎসবের অভিনয় সত্যই সিরিয়াস হয়ে উঠল। প্রফেসর এবং লিলি উভয়ে ধরে নিলেন, ফিফি ঐ বোকা মিঃ পাকড়াশীর সঙ্গে এনগেজ্‌ড্‌। ধারণা সঙ্গত বলেই অবজেক-শান সত্ত্বেও পীড়াপীড়ি চলল শুভ দিনটি অ্যানাউন্স করার জন্য।

ফিফি প্রমাদ গুনলেন। ব্যাপারটা লঘু করিতে গিয়ে সোজা কথা অমন ভাবে বাঁক নেবে তা ভাবতেও পারেননি। তাই উপস্থিত আলোচনাকে চাপা দিতে অপূর্ব অভিনয়ের শক্তি দেখালেন ফিফি। হাসি মুখে বললেন, সবাই যখন তেমারা ঠিক করে ফেলেছ, তখন শুভদিন পালাবে কোথায়? তবে দিন স্থির করতে হলে আর এক পক্ষেরও মত চাই। এরপর মিঃ পাকড়াশীর জানুর উপর হাত রেখে গদ্‌গদভাবে আরও কাছে এসে বললেন আমরা যখনই একসঙ্গে থাকতে পাই, তখনই তো আমাদের শুভ-

দিন। এর জন্য একটি বিশেষ দিনকে আলাদা করার প্রয়োজন আছে কি ?

বিবাহের আলোচনায় প্রফেসর এবং লিলি যখন পাকাপাকি কিছু করে ফেলার জন্য ব্যস্ত, তখন একটি অতিকায় কোলাব্যাঙের মত জীব অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ঘরে ঢুকল এবং সোজা লিলির কাছে গিয়ে জরুরী নালিশ শুনিয়ে বললে ; সেই লোকটা এসেছে, যে গাইতে আরম্ভ করলে থামতে চায় না।

আগন্তুক এদিকে এসে পড়ার আগে কোলাব্যাঙের পরিচয়টা দিয়ে ফেলি। আসলে জীবটি একটি দ্বিপদী মানুষ। তুলে রাখা কোন দীর্ঘ স্থূলকায় বেয়ারার লং-কোট পরায় দেহাবরণটি চলতি মাপের সীমানা পার হয়ে অভিযোগকারী বেঁটে মানুষটির প্রায় গোড়ালীর কাছে এসে পৌঁছিছে, তাই সমস্ত দেহ আবৃত হওয়ায় একটি সচল কোটকে কোলাব্যাঙের মত দেখতে লাগে। লোকটা আসলে গৃহস্থবাড়ির আটপৌরে চাকর। ঘরোয়া কাজে সে বাজার করে, মাছ কাটে, রাঁধে. আবার শৌখিন কাজে খানসামাও সাজে।

লিলির পিতার মৃত্যুর পর বাড়িতে আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব ঘটায় একই খানসামার পোষাক উত্তরাধীকারীর শর্তে একের পর এক নতুন চাকর বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করে আসছে। নতুনদের দেহের মাপ কোটের সঙ্গে মানানসই না হওয়ায় উপস্থিত লোকটিকে ব্যাঙ সেজে আসতে হয়েছে।

কোলাব্যাঙের আবির্ভাবে গল্পের খেই প্রায় হারাবার যোগাড় হয়েছিল, ইতিমধ্যে যে লোকটি 'থামতে জানে না' মিঃ পাকড়াশীর মতই, সেও বিনা অনুমতিতে ঘরে ঢুকে পড়ল এবং নিজের গুণ ব্যাখ্যা শুনেও কিছুমাত্র বিচলিত হল না, বরং 'থামতে জানে না'র জের টেনে নিয়ে বললে, আজ প্রেসিডেণ্ট সাহেবের ফরমাশে সেই গানটা গাইতে হবে। তিনি এখুনি আসছেন আমাদের নাম করা তবলচিকে নিয়ে। আজ আসর জমবে ভাল। আপনারা দেখে নেবেন সঙ্গতে কি ভাবে তবলচির তাল কাটাই। সুর আর

তালের লড়াইয়ে মাত্রার কাটাকাটি শুনতে হলে বেশ সময় লাগে। বড় ওস্তাদ, এক সোমেতে ফাঁদে ফেলা যায় না। যাই হোক, আসবার আগে আমাদের বসার জায়গা প্রস্তুত থাকা দরকার। ঘরে তো দেখছি ফরাস পাতা হয়নি, যে কয়েকটা টুকরো কার্পেট আছে তাও তো পায়ের তলায় পেষার জন্য রেখেছেন। এখন তানপুরা নিয়ে চেয়ারে তো বসা যায় না, কোথায় বসব জায়গাটা বলে দিন। একসঙ্গে এত কথা বলে বৃহৎ তানপুরাকে শিশুর মত বুকে জড়িয়ে ধরে গায়ক দাঁড়িয়েই রইলেন।

কার্পেটের ব্যবহার সম্বন্ধে গায়কের অজ্ঞতা দেখে লিলি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, খোঁচা মেরেই বললেন, চেয়ারে যখন বসা অভ্যাস নেই তখন মাটিতেই বসুন। কার্পেট তো আর গানের জন্য যেখানে সেখানে পাতা যায় না, আর ওগুলো পায়ের তলায় রাখার জন্যই তৈরি।

গায়ক মিঃ পাকড়াশীর মত রোগাক্রান্ত নন, সুতরাং গানের আসনকে পায়ের তলায় পেষার পিছনে যে ইঙ্গিত ছিল তা বুঝলেন এবং তাকেও পেষার জন্য প্রায় প্রস্তুত হয়ে উঠলেন, কিন্তু প্রেসিডেন্টের আবির্ভাবে সদিচ্ছা পূর্ণ হল না। প্রেসিডেন্ট বিলাত ফেরতা মানুষ। বিলাত যাত্রার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল নাম করা প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ। দ্বিতীয়, শিক্ষার ফাঁকে আদিরসের গবেষণায় প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট, যার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে অনেক জটিল সমস্যাকে পাশ কাটাতে হয় এবং সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী সময় নিলেও কোন অসুবিধা ছিল না। কারণ খরচ সম্বন্ধেও চিন্তার প্রশ্ন ওঠেনি, এবং স্বচ্ছলতার প্রাচুর্য এমন ভাবেই তাঁকে আগলিয়ে থাকত যে, কোন হিসাবেই তিনি ভুল না করে পারতেন না।

কোনকালে প্রাচুর্যকে জমিয়ে রাখার ভার ছিল পূর্বপুরুষদের উপর। বর্তমানে খরচের সহজসাধ্য কর্তব্য সাধনের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন প্রেসিডেন্ট সাহেব নিজে। বেয়াড়া রকমের আর্থিক

প্রাচুর্য অনেককে এমন ভাবে ভারাক্রান্ত করে ফেলে যে, ওজন বহনে অসমর্থ হয়ে যথেচ্ছ খরচ না করে তাঁরা পারেন না।

এদিক দিয়ে প্রেসিডেন্ট সাহেবকে একটি উঁচুদরের দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে, কারণ তাঁর ব্যায়বহুল শৌখীনতার সীমা ছিল না। তাঁর ঘরোয়া কথায় খুঁটিনাটি উপস্থিত বলার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখছি না, তবে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ এবং সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে কিছু না বললেই চলে না, কারণ, প্রেসিডেন্ট পদ প্রাপ্তির সঙ্গে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সমিতির ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, এবং তার মধ্যে সঙ্গীতকে একটি কালচারের অঙ্গ ধার্য করায় প্রেসিডেন্ট সাহেব ক্লাবের উক্ত পদ গ্রহণে সমর্থন দেন।

ইতিমধ্যে লিলি প্রফেসরের গায়ে ঝুঁকে পড়ে প্রকাশ্যেই গোপনীয় কোন কথা সাহেবী ধরণের তালু দিয়ে মুখ আড়াল করে বললেন—মনে হয়, ফিফি এনগেজমেন্টের বাইরে চলে গিয়েছে। খোঁজ নেওয়া ভাল, বিবাহের পাটটা নিখরচায় শেষ করল কিনা। ওঁকে তো আমরা চিনি। খরচের নাম উঠলেই ওঁর হৃৎকম্প শুরু হয়ে যায়। আর আমাদের ধারণা অনুসারে যাঁকে বিয়ে করেছে, সে যে কি বস্তু সে তো দেখতেই পাচ্ছ।

শেষের কথাটি এমন উচ্চরবে বলা হয়েছিল যাতে মিঃ পাকড়াশীর কানে গিয়েও পৌঁছায়। মিঃ পাকড়াশী বোকা নাম্বার ওয়ান হলেও জানতেন, তিনি একটি সজীব মানুষ, বস্তু নন। তার উপর যে মানুষ দৈন্যের ভারে কাবু তাকে গরীব বললে খোঁড়াকে ল্যাংড়া বলার মতই আঁতে গিয়ে ঘা লাগে। এবার মিঃ পাকড়াশী ফিফির খুব কাছেই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, ভাবটা যেন রণং দেহি।

লিলি প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে সেই বাঁকা মুচকি হাসির সাহায্যে বললেন, দেখলে না, দরদ দিয়ে হৃদয়ের কথা বলতে দাড়ির পর্যন্ত অন্তর নাড়া খেল। দেখছ না কি ভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে ?

দাড়ির অধিকারীকে এবার ফিফির দিকে মুখ ফেরাতে হল একটা কিছু ভাব অভিব্যক্তির সমর্থন খোঁজার জন্য। ফিফি দেখল, এখন নাম্বার ওয়ানের সবকিছুতেই সমর্থন না দিলে যাচ্ছেতাই কিছু একটা ঘটে যাবার সম্ভাবনা আছে। কোন প্রকারে আজকের সভা থেকে উদ্ধার পেলে কাল দরকার হলে মানহানির জন্য উকিলের চিঠি দিতেও বাধবে না। কেবল আজকের দিনটা সামলাতে পারলেই হয়।

আবার দরজায় ঘণ্টা পড়ল। এবার এলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর পিছনে দেখা গেল একজন পুরুষ ও একটি মহিলা। মহিলার নাম শ্রীমতী মহাশ্বেতা, যৌবনশ্রীর একটি বিস্ময়কর প্রতীক। কেবল ঐটুকুই তার ব্যক্তিত্বের বিশেষ আকর্ষণ নয়, তিনি লাবণ্যময়ী, গৌরী, শান্ত ও স্বল্পভাষী। বেশভূষাতেও উত্তেজক আকর্ষণের কোন চেষ্টাই নেই। সবকিছু জড়িয়ে তাঁর বৈশিষ্ট দেখে মনে হয় তাঁর সঙ্গে ঘরোয়া মাটির ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। প্রাচীন কৃষ্টির বার্তাবাহক হয়ে এসেছেন আজকের পরিবেশে নতুন কথা শোনার জন্য। দীর্ঘকাল বিলাতে বসবাস সত্ত্বেও যে পাশ্চাত্য প্রভাবের কাছে নত না হওয়া সম্ভব হতে পারে তা শ্রীমতী মহাশ্বেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না হলে বিশ্বাস করবার উপায় নেই।

প্রেসিডেন্ট সাহেব ঘরে ঢুকতেই লিলি সহজবোধ্য ইঙ্গিতে প্রফেসরকে উঠে দাঁড়াতে বললেন প্রেসিডেন্টকে উপযুক্ত সম্মান দেবার জন্য। হাউ ডু ইউ ডু, গুড ইভনিং, নমস্কার, কেমন আছেন? ইত্যাদি ভব্যতা এবং আনুষঙ্গিক অপরিহার্য কথা শেষ হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট দেখলেন গানের আসরের জন্য ফরাস পাতা হয়নি। এর জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না, কারণ দুদিন আগেই সোসাইটির সেক্রেটারী লিলিকে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে আজকের আসরে দুজন ক্লাসিক্যাল সুরে গান গাইবেন, তথাপি গায়কদের বসবার উপযুক্ত স্থান না থাকায় তিনি বিরক্ত হলেও কোনরূপ কৈফিয়ৎ না

চেয়েই ধোপছুরস্ত শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতিসহ মাটিতেই বসে পড়লেন এবং গায়ক ও পার্শ্বস্থ মহিলাকে বললেন, আপনারাও বসুন।

কোনরূপ দ্বিধা না করেই উভয়ে প্রেসিডেণ্ট সাহেবের অনুরোধকে আদেশের মতই মানলেন। ইতিমধ্যে তবলচি ঘরে প্রবেশ করলেন। এদিকে বিলাত ফেরতা সাহেবী চালে শিক্ষিত প্রেসিডেণ্ট মাটিতে বসে পড়ায় প্রফেসর সাহেব উচ্চাসনে বসায় কুণ্ঠা বোধ করতে লাগলেন, ফলে তাঁকেও মেঝেতে বসতে হল। লিলি এবং ফিফি এইরূপ অবস্থায় করে কি? গত্যন্তরে ঘরের চেয়ার ও সোফাগুলি খালি হয়ে গেল। সকলেই তখন মাটিতে আসীন।

প্রেসিডেণ্ট সাহেব বললেন—আজ তো এখানে কক্‌টেলেরও ব্যবস্থা হওয়ার কথা। আমাদের গায়ক মিশিরজীর কাছ থেকে ইন্সপায়ার্ড সুর পেতে হলে একটু উত্তেজক কিছু ভিতরে না পড়লে সুর যন্ত্রচালিতের মত হয়ে যায়। তাই বলি, ব্যবস্থা যখন আছেই তখন মিশিরজীকে একটু তাতিয়ে নেওয়াই ভাল। এরপর পাশের মহিলাকে উল্লেখ করে বললেন, অফুলি সরি। শ্রীমতী মহাশ্বেতাকে তো আপনাদের সঙ্গে ইণ্ট্রোডিউস-ই করলাম না। এই দেখুন, আমি আর্টিস্ট না হয়েও আর্টিষ্টিক লাইসেন্স নেওয়ায় কি রকম পোক্ত হয়ে উঠেছি।

পরিচয়ের পালা শেষ হওয়ার পর মিস লিলি বললেন, আপনাদের অপেক্ষাতেই ছিলাম, তাই ও জিনিসটা এখনও আরম্ভ করা হয়নি। মিস্টার প্রেসিডেণ্টের স্পেশাল ব্রাণ্ড আমি জানি, কিন্তু মিশিরজীর?

প্রেসিডেণ্টের উত্তর শোনা গেল, নীট ব্রাণ্ডি! তার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা জল চলতে পারে। তবে পেগটা সুপার পাতিয়ালা হওয়া দরকার। প্রস্তাব শুনে মিশিরজীর একটি সহাস্য সমর্থন পাওয়া গেল।

প্রফেসর বললেন, মিশরজী যখন তাল ঠোকা গানে অভ্যস্থ, তখন আমি ভেবেছিলাম ওঁকে তাতাতে গেলে একটু চড়া রকমের স্বদেশী ধোঁয়া দরকার, যে ধোঁয়ার এক টানই ব্যোমে তুলে দেয়।

লিলি শ্রীমতী মহাশ্বেতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি?

নবাগতা মহিলা কিছু উত্তর না দিয়ে একটু মাথা নত করলেন, ফলে উত্তর দিতে হল প্রেসিডেণ্ট সাহেবকে. জানালে, পুরো এক গ্লাস ষ্ট্রং লিম্বু পানি।

লিলি আঁৎকে উঠে বললে, ও মা সে কি?

প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী মহাশ্বেতার হয়ে এবারেও উত্তর দিলেন, উনি বিলাতেও এই রকম অশোভনীয়তাকে প্রশ্রয় দিয়ে আত্মার শুদ্ধি করতেন। ব্যাভিচারিতা আর কাকে বলে? এই প্রসঙ্গে জানাই, ইনি মিশিরজীর ছাত্রী। ঠুংরী চালে ভালই গান। বিলাতে বছর তিনেক আমাদের বাড়িতে মিশিরজীর কাছে শিখতে আসতেন, তারপর এখানে ফিরে আসার পরেও শেখাটা ছাড়েননি।

ফিফি বললেন আপনি তো বছর দুই হবে বিলাত থেকে ফিরেছেন; তার মানে, তিন আর দুয়ে পাঁচ পাঁচ বছর ধরে শেখার পরও আপনি বলছেন. শিখছে? এ শেখার শেষ কোথায়?

এইবার শ্রীমতী মহাশ্বেতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উত্তর দিলেন, শেষ নেই বলেই তো শেখায় আনন্দ পাই; শেষ থাকলে তো কোন একটা হিসাবী সময়ে আনন্দ ফুরিয়ে যেত। কতকটা তক্‌মার প্রতিশ্রুতি মার্কা অ্যাকাডেমিক পরীক্ষায় পাশ করার মত।

লিলি বললেন, শ্রীমতী মহাশ্বেতা বোধহয় কোন গভীর তত্ত্বে ঢোকবার চেষ্টায় আছেন। প্রফেসর সাহেব এদিকটা সামলান। আপনাদের জন্য ওদিকটা আমি নিজে গিয়ে দেখি। বলে লিলি ভিতর বাড়িতে চলে গেলেন

গভীর তত্ত্ব ও তর্কের দিকে প্রফেসরকে লেলিয়ে দেওয়ায় তিনি প্রস্তুত হয়ে বসলেন। তারপর গম্ভীর ভাবেই বললেন, শ্রীমতী মহাশ্বেতা যেভাবে সুন্দরকে জড়িয়ে আছেন, তাতে তাঁর বাহ্যিক

রূপ ছাড়াও অন্তরও যে সুরকে সুন্দরের মধ্যে জড়াবে তাতে আর বিচিত্র কি? তাহলে গান শুরু হোক।

প্রেসিডেন্ট বললেন, আপনাদের অরগ্যান আর পিয়ানোর সঙ্গে তো ঠুংরী চালের গান চলে না, কাজেই একটু অপেক্ষা করুন, সুরকে ধরে রাখার জন্য সারেঙ্গী আসছে।

ফিফি বললেন, সারেঙ্গী! সেটা আবার কি বাদ্যযন্ত্র? ষাঁড়ের সঙ্গে কোন মিল নেই তো?

প্রেসিডেন্ট : ষাঁড়ের সঙ্গে যন্ত্রের মিল না থাকলেও, কখনো সখনো সুরের সঙ্গে যোগ থাকে, যেমন ঋষভের পর্দা এলে ষাঁড়কে বাদ দেওয়ার উপায় নেই। ষাঁড় তো সামান্য কথা, শুনতে পাই ধ্রুপদী চালে সিংহনাদের মত হুংকারেরও স্থান আছে।

প্রফেসর : বলেন কি? গানের সঙ্গে হুংকার, তারপর নখের আঁচড় আর দাঁতের কামড় হলেই তো চমৎকার! লোকে বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। শেষ পর্যন্ত গান শুনিয়ে আমাদের কি ঘেয়ো করে ছাড়বেন? আপনি যে ভাবে সুরের সম্পদ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, তাতে মনে হচ্ছে এই ধরণের গান শোনার ভয়ের কারণও যথেষ্ট আছে।

প্রেসিডেন্ট : একটু আগেই আপনি যেভাবে শ্রীমতী মহাশ্বেতার সঙ্গে সুন্দরকে জড়িয়ে ছিলেন, সেইরূপ ভয়ের সঙ্গেও সুন্দরের যোগ আছে, কারণ শ্রীমতীর দৃষ্টিতে এমন আগুনের ফুলকি আছে, যা অবাঞ্ছিত মানুষকে পুড়িয়ে মারে। সুন্দর ও ভয়ের এমন সমন্বয় ক্বচিৎ দেখা যায়।

প্রফেসর : আপনার কথার মধ্যে কেমন যেন একটা উগ্র হেঁয়ালীর ভাব পাচ্ছি।

প্রেসিডেন্ট : হেঁয়ালী এখুনি সরল হয়ে যাবে। পাশের ঘরে ঠুংঠাং শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না? ককটেলী সরবৎ তৈরি হচ্ছে। কড়া দাওয়াই। ও ভেতরে ঢুকলে ভয় একেবারে কেটে যাবে, তারপর মনে রং লাগার সঙ্গে সঙ্গে বেসুরকেও সুরের মধ্যে আনায় কোন

অসুবিধা থাকবে না। ষাঁড়ের সিং আর বাঘের নখ তখন তুচ্ছের মধ্যে গিয়ে পড়বে।

প্রফেসর : এটাও যে একটু কেমনতরো লাগছে।

ইতিমধ্যে লিলি সুসজ্জিত কোলাব্যাঙের হাতে ট্রে-র উপর ডিকেনটার সহ ওয়াইনের গ্লাস সাজিয়ে আসরে প্রবেশ করলেন এবং অসমাপ্ত কথোপকথনের জের টেনে নিয়ে বললেন, সব শুনেছি। গানের আগে ষাঁড়, সিংহ, নখ, দাঁত, ইত্যাদি এসে পড়ায় আসরের প্রয়োজনীয় অ্যাটমসফিয়ারই বদলে যাচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট : একটু জংলী না হলে চলে কেমন করে? পিয়ানো এবং অরগ্যান বাদ দেওয়ায় যেখানে ষাঁড় আসে সুরকে সামলাতে সেখানে একটু বুনো হওয়াই দরকার।

ফিফি : এখন আমরা কালচারের সঙ্গে যোগ রাখতে চলেছি, সুতরাং জঙ্গলের আবহাওয়াকে বাদ দেওয়াই ভাল।

এরপর ট্রে-র উপর রক্ষিত ডিকেনটার প্রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে আসতে তিনি স্বহস্তে মিশিরজীর মাত্রা ঠিক করে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। ভিন্ন আগন্তুকরা তাঁদের পাওনা-ভাগ পাবার আগেই মিশিরজী এক চুমুকেই গেলাস খালি করে দিলেন। কোথায় রইল গ্লাসকে উর্দ্ধলোকে তুলে ভব্যতার বিলাতী মন্ত্রপাঠ, যেমন চিয়ারো, অলদা বেস্ট, ইওর হেল্‌থ্‌ ইত্যাদি।

মিঃ পাকড়াশী এতক্ষণ চুপচাপই বসেছিলেন। তিনি দেখলেন, সকলেই যখন কিছু ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাঁরও কিছু বলা দরকার। অকস্মাৎ প্রস্তাব করে বসলেন, আমার ইচ্ছা, মিস ফিফিও দু'একটা গান করেন।

মিস ফিফি যে গাইতে পারেন না এমন কথা নয়, কিন্তু তিনি আধুনিক পন্থীর মন্ত্রে দীক্ষিত। কাজেই তিনি ওস্তাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে গান গাওয়ায় ফিফির ঘোরতর আপত্তি ছিল। তিনি বিরক্তির সঙ্গে বললেন, এখানে আমার গান চলবে না।

গান না চলার কনফার্মেশান যে ভাবেই হোক, মিঃ পাকড়াশীর

প্রস্তাবের সঙ্গে চিমটি কাটায় ক্ষতস্থানের জ্বালা মিঃ পাকড়াশীকে বুঝিয়ে দিয়েছিল ওটা গভীর প্রেমের নিদর্শন, সুতরাং ইচ্ছামত এগিয়ে চলায় তিনি এখন বাধামুক্ত। আর কাল বিলম্ব নয়। বিবাহের প্রস্তাবটা তাঁর নিজের দিক থেকেই আগে আসা দরকার, এবং তা এখুনিই সেরে ফেলা ভাল।

এরপর মিঃ পাকড়াশী লিলির মতই ফিফির অত্যন্ত গা ঘেঁষে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে ; সারা জীবন আমরা দুজনে সেই কথার সঙ্গে জড়িয়ে থাকব, তার মানে জড়িয়ে থাকবে ভালবাসা। আরও সোজা করে বলি, আমি তোমাকে আমার করতে চাই। তাই আমার বক্তব্যের সম্বোধনে আপনিকে ছাঁটাই করতে হল।

বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিফি 'এ্যাঁ ?'...বলেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ে বললেন, বিহেভ !

দৃশ্যটি অপরূপ, কারণ যেহেতু নখের আঁচড়ে যা ঘটেছে তা দৃষ্টির অগোচরে এবং কানে কানে যে কথা বলা হল, তাও কেউ শুনতে পায়নি তবু রসের কারবারে অনুমান অনেক সুবিধাজনক সম্ভাবনাকে সামনে খাড়া করে দেয়। লিলি তাড়াতাড়ি বড়-বড় একটি নির্জলা ব্র্যাণ্ডির পেগ মিঃ পাকড়াশীর হাতে তুলে দিলেন। এত বড় সম্মান পাওয়ার পর মিঃ পাকড়াশীর উঠে কোমরভাঙ্গা অবস্থায় অবনত মস্তকে দান গ্রহন করা উচিৎ ছিল, বিদেশী প্রথায় যাকে বলে বাউ, কিন্তু এখনও মিঃ পাকড়াশী অতটা স্মার্ট হননি, কাজে কাজেই বসে বসেই পানীয় গ্রহণ করলেন, এবং বিনা থ্যাঙ্ককেই এক চুমুকে গোটা গ্লাস খালি করে দিলেন।

লিলি তারপরই আর এক গ্লাস ফিফির হাতে তুলে দিলেন। লিলির একটি বেশ জোর অভিযোগ করার ছিল, কিন্তু হল না, ফিফির গালে ছোট্ট একটি ঠোনা মেরে বললেন, সব দেখেছি। এটা খেয়ে ফেল, রস লেগেছে মনে, ওটাকে জমিয়ে তোল।

পানের ভদ্রোচিত প্রথা অজানা থাকায় মিশিরজীর মতই মিঃ

পাকড়াশী এক চুমুকেই পুরো গ্লাস নিঃশেষ করে ফেললেন। অতখানি ব্র্যাণ্ডি এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলার পর কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা প্রেসিডেন্ট জানতেন। তাই অবাঞ্ছিত কিছু ঘটার আগেই তিনি মিশিরজীকে গাইতে অনুরোধ করলেন।

মিশিরজী শ্রীমতী মহাশ্বেতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হুজুর, আগে সাকরেদের গান হোক তারপর আমি তো আছিই।

গান শুরু হবার পর আলাপের মাধ্যমে সুর যখন সবে প্রাণস্পর্শী হতে শুরু করেছে, তবলচি প্রস্তুত হয়েছে সঙ্গতের জন্য, এমনি সময় একটা তুমুল কাণ্ড বেধে গেল।

ইতিমধ্যে গতিশীল তরলাগ্নি সব কিছু জ্বালিয়ে দিয়ে মিঃ পাকড়াশীর অন্তরে প্রবেশ পথ খুঁজে নিয়েছিল। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে ভিতর থেকে নিজেকে অসাধারণ প্রমাণ করার জন্য যে তাগিদ আসতে আরম্ভ করল তাকে আর সামলানো গেল না। বিবাহের প্রস্তাবে ফিফি সরে যাওয়ায় মিঃ পাকড়াশীর আত্মমর্যাদায় ঘা লেগেছিল। তিনি ভেবে নিলেন যে ফিফি যেভাবেই অভিমান প্রকাশ করুক তার বাড়াবাড়িকে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না, এবং আচরণটি ভবিষ্যতের সাধ্বী-স্ত্রী এবং বর্তমানের বাগদত্তার পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়। অতএব ফিফিকে সহধর্মিণীর স্থান দিতে হলে তাকে কিছুতেই আদর্শভ্রষ্টা হতে দেওয়া চলে না। সিদ্ধান্ত প্রকাশের অচিরাৎ দরকার থাকায় মিঃ পাকড়াশী ফিফির টাইট গেঞ্জীর শেষের দিক ধরে টান মেরে আদেশ করলেন, বস।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেল। ফিফি ভব্যতার মাথায় ঝাঁটা মেরে চিৎকার করে বললে, সেভ মি ফ্রম দি ব্রুট। ঘটনাটি বাস্তবিকই একটি জাত স্ক্যাণ্ডাল হয়ে দাঁড়াল। তার ওপর ফিফি কেবল ব্রুট সম্বোধনেই থামল না, ফিফির তখন ভিতরে আগুন লেগে গিয়াছে। ফলে, ব্রুট-এর সঙ্গে ড্যাম-ফুল-সোয়াইন এবং দেশী সম্বোধন শালা ছোটলোক বলতেও বাধল না।

শিক্ষা, মার্জিত রুচির আড়াল দেওয়া পালিশ করা আচরণে

ভ্যাজালহীন ভোঁতামি চালানোর দক্ষতা গানের আসরে যে পরিস্থিতি নিয়ে এল, তাকে বুনো বললেও অত্যুক্তি হয় না। পরিস্থিতির সবদিক বিচার করে প্রেসিডেন্ট সাহেব জানালেন, আজ তাহলে সভা ভঙ্গ হোক।

মিঃ পাকড়াশীর মানসিক অবস্থা মোটেই ভাল না। সেদিন-কার ঘটনার পর থেকেই মিঃ পাকড়াশী ভাবছিলেন ফিফি যেভাবে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধ স্থাপন করল, তাতে যৎসামান্য রাগের ঝাঁঝ থাকলেও মেনে নিতে হবে যে রাগের প্রদর্শনী কেবল লোকচক্ষুর সামনে লজ্জাকে আড়াল দেওয়ার জন্যই হয়েছিল। আসলে ফিফি যে মিঃ পাকড়াশীকে ভালবাসে সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং মিঃ পাকড়াশী প্রস্তাবকে কিভাবে পাকা করবেন তাই নিয়ে তার বিশেষ চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। যুক্তি একটি পাকা সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে দিলেও মিঃ পাকড়াশী ভাবতে লাগলেন, ভবিষ্যতে নখের আঁচড় না খেয়ে কিভাবে গা ঘেঁষা কথার সুবিধা নেওয়া যায়। এ তো আইনের কথা নয় যে উকিল বাড়ি গেলেই যাহোক একটা মতলব বাতলে দেবে। পরের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে প্রেমের কাজে এগুলে বুদ্ধিদাতা যদি উপদেশকেই ক্যাপিটাল করে লাভের হিসাবে ভাগ বসাতে চান, তবেই তো চমৎকার। সুতরাং এমন লোকের কাছে যেতে হবে যে এইরকম লোভনীয় লাভ সম্বন্ধে নির্বিকার।

মিঃ পাকড়াশী যে বন্ধুর কাছে উপদেশের জন্য উপস্থিত হলেন, তিনি সমস্ত শুনে বললেন, ছাখ মনে হচ্ছে তুমি একটি বিশ্রী রকমের রোগ বাধিয়েছ। এ রোগ সারাতে হলে কোন সাইকিয়্যাট্রিস্টের কাছে যাওয়াই ভাল। সাইকিয়্যাট্রিস্ট কোন্ জাতীয় চিকিৎসক তা মিঃ পাকড়াশীর জানা ছিল না। যাই হোক, উপদেশের ফলে যার ঠিকানা বার হল, তিনি একজন মনের ডাক্তার।

দিনক্ষণ স্থির করেই মিঃ পাকড়াশী অজানা চিকিৎসকের

বাড়িতে উপস্থিত হলেন। এ এক নতুন প্রকারের চিকিৎসা। নাড়ী না দেখেই ডাক্তার সাহেব বলে বসলেন, এ বাড়িতে যখন এসেছেন বিশেষ করে বন্ধুবরের চিঠি নিয়ে ১৬ টাকা দিলেই চলবে।

চিকিৎসকের উদার হৃদয়ের নিদর্শনে মিঃ পাকড়াশী বিশেষ প্রীত না হলেও দাবীর সমর্থনে নগদ ১৬ টাকা বার করে দিলেন। তারপর চিকিৎসক বসেই আছেন, নাড়ীও দেখেন না কোন যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষাও করেন না, কেবল তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা মিঃ পাকড়াশীকে দেখতে থাকেন, আর তার সঙ্গে দুই একটি অবান্তর প্রশ্ন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টেবিলের উপর আঙুলের ঠোকা মারতে লাগলেন। মিঃ পাকড়াশী অনুমান করলেন এত চিন্তার কারণ যেখানে আছে সেখানে নিশ্চয়ই রোগটি মোটেই সুবিধার নয়।

বেশ খানিকক্ষণ সময় কাটার পর ভদ্রলোক মিঃ পাকড়াশীকে বললেন, ক্লাবঘরে সকলের সামনে প্রস্তাবটি কি এই প্রথম না এর আগেও অন্য কোন পাত্রীর উপর ব্যবহার করেছিলেন? যদি করে থাকেন তো সে প্রস্তাব কী কাল, পাত্রী এবং পরিবেশ বিবেচনা করেছিলেন? না এটা আপনার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে? মানে যাহোক একজন কাউকে পেলেই হল!

মিঃ পাকড়াশী ভাবলেন, প্রশ্নের পিছনে একটি নোংরা ইঙ্গিত আছে, অর্থাৎ ডাক্তার প্রমাণ করতে চাইছেন যে তিনি একটি চরিত্রভ্রষ্ট ব্যক্তি, তিনি পাড়া ঘোরেন কেবল বদ প্রস্তাবের অভ্যাস নিয়ে। ডাক্তারের মতে ওটা নাকি অতৃপ্ত ক্ষুধার পীড়নে অন্তর্জ্বালার লক্ষণ। সুতরাং ব্যাধি মুক্ত হতে হলে কালবিলম্ব না করে এখুনি বিবাহ হওয়া দরকার, পাত্রী ভাল কি মন্দ ওসব বিচারের সময় নেই।

চিকিৎসকের উপদেশ মিঃ পাকড়াশীর ভাল লাগলেও কাজে লাগানোয় বেশ অসুবিধা ছিল। কারণ চিমটি কাটার বেদনায়

তিনি যে বোলতার হুল ফোটানোর অভিজ্ঞতা পেয়েছেন তা তো ডাক্তার সাহেব জানেন না, তাই নখী মেয়েকে বশ করার মত শক্তি সংগ্রহ করতে হলে নিজের মনকেও তাগৎদার করে নিতে হয়। মন যখন রোগগ্রস্ত তখন কড়া দাওয়াইয়েরও দরকার আছে, সুতরাং এ ডাক্তারের কাছে নয়। কিন্তু চিকিৎসক পরিবর্তনেও তো উপদেশের দরকার, এখন তিনি যান কার কাছে? উদ্দেশ্য সাধু হলে একটা কিছু পথও বেরিয়ে আসে। মিঃ পাকড়াশীও পথ পেয়ে গেলেন।

এবার মিঃ পাকড়াশী কোন বন্ধুর কাছে না গিয়ে নিজের কাছ থেকেই উপদেশ গ্রহণ করলেন। এবং নিজেই ঠিক করে ফেললেন যে রোগটার সূত্র নিশ্চয়ই হৃদয়. সুতরাং হৃদরোগের বড় চিকিৎসকের কাছে যাওয়াই দরকার।

চিকিৎসকের সন্ধান পেতে সময় লাগল না, তিনি উপস্থিত হলেন একটি নাম-করা হার্ট স্পেশালিস্টের কাছে। এবারও ঘরে বসেই ডবল ফি। ষোলর জায়গায় বত্রিশ। ডাক্তার সাহেবের ঘরে কোন অসুখের কথা বলার আগেই তাঁর সহকর্মী অতি নম্রভাবে বললেন, বত্রিশ টাকা। দাবীর দক্ষিণা বার করে দেওয়ার পর ডাক্তার সাহেব মিঃ পাকড়াশীকে শুইয়ে দিলেন একটি স্কুলের উঁচু বেঞ্চির মত সাদা রঙ করা ইস্পাতের শয্যায়। পরীক্ষা শুরু হল।

প্রথমেই চলতি মতে ডবল কানে নল লাগিয়ে বুকের ভিতর নানা শব্দের খবর নিলেন। মনে হল খবর শুভ নয়। না হবারই কথা। বাইরের শ্রবণ-শক্তি দিয়ে যে মানুষ হৃদয়ের খবর জানতে চায়, তিনি খাঁটি কথা জানার জন্য এগিয়ে এসেছেন বুঝতে পারলেই হৃৎকম্প শুরু হয়ে যায়, সাময়িক উত্তেজনার খবর ডাক্তারকে শুনতে হয়, আসল রোগের খবর নয়। তার উপর এবার যে সব যন্ত্রের মাঝখানে মিঃ পাকড়াশী এসে পড়েছেন, তাতে কোন রোগ না থাকলেও সহজ মানুষেরও অন্তরে কাঁপুনি

এসে যায়। মিঃ পাকড়াশী সত্যই অন্তরে কাঁপছিলেন। কাঁপুনির সময় দেখলেন ডাক্তার সাহেবের সহকর্মী একটি চৌকো চামড়ার মোড়া বাক্স নিয়ে এলেন, তার ভিতর ও বাইরে থেকে নানা প্রকারের নাড়ি-ভুঁড়ির মত রবারের নল এবং কালো কালো মোটা রবারের মোড়া তার বেরুতে লাগল। সব ক'টারই ডগায় টেলিফোনে কথা ধরার মত একটি করে কলকে লাগানো। হৃদয়ের খবর নিতে গিয়ে ডাক্তার সাহেব গোড়ালী থেকে আরম্ভ করে দেহের যেখানে সেখানে ইচ্ছামত নলের ডগাটি টিপে ধরতে লাগলেন। নগদ বত্রিশ। টাকা নিয়ে পরীক্ষা শুরু হয়েছিল, সুতরাং ডাক্তার সাহেবও দেখিয়ে দিলেন যে তিনি ফাঁকি দিয়ে পয়সা নেন না।

যন্ত্রের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর স্মৃতির পরীক্ষা শুরু হল। সহকারীকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলে ডাক্তার সাহেব মিঃ পাকড়াশীকে ইস্পাত শয্যা থেকে নামতে বললেন, তারপর বললেন, হৃদয় সম্বন্ধে কতকগুলি পারিবারিক পুরনো কথা জানা দরকার। তার সঙ্গে মনে হল কয়েকটি গোপনীয় প্রশ্নও তাঁর জন্যে আলাদা করে রাখা আছে। রোগটা হৃদয় ঘিরে থাকার জন্য বুক ধড়ফড়ানীকে সন্দেহের চক্ষে দেখায় মিঃ পাকড়াশীর কিছু বলার ছিল না, কারণ তাঁর ধারনা প্রথম পরীক্ষায় পুরোপুরি ধরা না পড়লেও কানাঘুষোয় ফিফির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার খবর এখানেও পৌছে গিয়েছে, সুতরাং গোপনীয় কথায় যে সব প্রশ্ন থাকতে পারে তা অনুমান করা শক্ত নয়। মিঃ পাকড়াশী বিবেচনা করে দেখলেন, অন্তর্যামী চিকিৎসকের কাছে রোগের সূত্রকে লুকিয়ে রাখা যাবে না। সব স্বীকার করতে হলে ফিফি ছাড়া বড় রাস্তার সেই দোতালা বাড়ির বারান্দায় ঝোলানো শাড়ির কথাও বলতে হয়। কিন্তু শাড়ির সঙ্গে যে প্রেম হয়েছিল তাতে তো শাড়ির মালিককে দেখারই সুযোগ পাননি, ছোঁয়া তো দূরের কথা। তাছাড়া রাস্তার এ মোড়ে ও মোড়ে তাঁর দৃষ্টি অনেক জায়গাতেই তো বাছাই করা স্থানে আটক পড়ে।

একবার কি একটা বেশী রকম ভাল করে দেখতে গিয়ে প্রায় মারও খাবার জোগাড় হয়েছিল।

যাই হোক, বুকের রোগ পরীক্ষা করতে গিয়ে যে ডাক্তার রুগীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে এবং গোপনীয় খবর জানতে চায়, তার পক্ষে যা খুশি তাই গড়ে তোলা মেটেই শক্ত কাজ নয়। ফলে কিছু গোপনীয়তা বার করে এনে না হয় তাঁর কুচরিত্রের উপর একট দাগ লাগানো যেতে পারে, কিন্তু তাই বলে পরিবারের পুরানো কথা জানার কি অধিকার আছে ডাক্তারের? মিঃ পাকড়াশী স্থির করে ফেললেন যে, এ ডাক্তার মোটেই সুবিধার লোক নয়। কারণ একজনকে দুশ্চরিত্র অনুমান করে গোটা পরিবারকে তার সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা যেখানে হয় সেখানে এক মুহূর্তও থাকা নয়। উত্তেজনায় মিঃ পাকড়াশী চিকিৎসার পালা ওখানেই শেষ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

উত্তেজনা সঙ্গে নিয়েই মিঃ পাকড়াশী ঘর-মুখো হলেন। হৃদয় পরীক্ষাকে জড়িয়ে নানা সম্ভব অসম্ভব কথা ভাবতে ভাবতে পথ চলছিলেন। অন্যমনস্কে ডাকসাইটে রোয়াকটার সামনে এসে পড়তেই শুনলেন, ওরে, পয়লা নম্বর! তারপরই দলের পাঁড় রোয়াক থেকে নেমে একেবারে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল এবং কোনরকম গৌরচন্দ্রিকার আড়ালে না গিয়ে সোজা বলে বসল, দাদা, আমাদের ক্লাবের বাকী চাঁদাটা?

দাদা অবাক! চাঁদা চাইলে ও রকম বিস্ময়ের অভিনয় অনেকেই করে থাকেন, সুতরাং অবাক হয়েও দাবীকে দমানো গেল না। কোন্ ক্লাব? কবে থকে বাকি? এবং কত বাকি? ইত্যাদি স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠতেই পাঁড় জানিয়ে দিল, ওগুলো বাজে কথা। বাকী টাকাটা অনেকদিন থেকেই পড়ে আছে এবং পাওনা সুদে বেড়ে উঠেছে। আর সময় দিতে আমরা অপারগ। তবে পঞ্চাশ টাকা বার করে ফেললে, বাকীটা পরে নিতে পারি।

বলার ভঙ্গীতে যে রকম রোখা ভাব ছিল তাতে টাকা না দিলে

পাশবিক প্রথায় বলপ্রয়োগ সুনিশ্চিত বলেই মনে হল। পরিস্থিতিতে দুর্যোগ আসন্ন বুঝেই দাদা পকেটে কিছু নেই জেনেও যথাস্থানে হাত পুরে দিলেন। ডাক্তারকে দক্ষিনা দেবার পর যা পড়েছিল তা মাত্র কয়েকটি ছোটখাটো মুদ্রা। মিঃ পাকড়াশী সবদিক বিচার করে কি ভাবলেন তিনিই জানেন। হঠাৎ দেখা গেল তিনি রাস্তার মাঝেই বসে পড়েছেন, তারপরই চোখ উপর দিকে তুলে মুখ হাঁ করে বুক চাপড়াতে লাগলেন।

মনোকূল পরা সাহেবী কেতায় সজ্জিত কোন ভদ্রসন্তান রাস্তার মাঝে বুক চাপড়াতে থাকলে, কলকাতার মত শহরে লোকে ভেবে নেয় দৃশ্যটি আকস্মিক মৃত্যুর সূচনা। এরই ভিতর রকবাজদের মধ্যে কয়েকটি ছোকরা রক থেকে নেমে মিঃ পাকড়াশীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। একজন নেতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, পঞ্চাশ টাকার জন্যেই কি ছুণ্ডি কাটতে হবে নাকি? ছুণ্ডি কাটা রকবাজদের একটি কোড ওয়ার্ড, যার গূঢ় অর্থ হল গলা ধাক্কা, তার সঙ্গে চাঁদা করে মার।

মিঃ পাকড়াশী ছুণ্ডি কাটার সঠিক অর্থ না জানলেও বুঝলেন, শব্দ দুটির পিছনে বেশ বড়সড় বিপদের ইঙ্গিত আছে। এদিকে পকেটও প্রায় গড়ের মাঠ। এখন পকেটের মধ্যে যা আছে, তা যে দাবীর অঙ্কের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না, সে কথা পকেট উল্‌টিয়ে দেখালেও ওরা নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করবে না। মিঃ পাকড়াশী আতান্তরে পড়ে গেলেন। দেহের পরিচ্ছদগুলি ঠিক ভাবে পরা হয়েছে কিনা একটু টেনে টুনে দেখে নিলেন। কারণ তিনি অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন যে কিছু না পেলে শেষ পর্যন্ত জামা কাপড়ে টান পড়বে এবং রাস্তার মাঝে বিবস্ত্র করে দেওয়া এদের শাস্তিদানের একটি শাস্ত্রসম্মত রীতি।

নিজের কোটের পকেট উল্‌টিয়ে দিয়ে তিনি যখন দেখাতে চাইলেন দাবী অনুসারে দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই, তখন রকবাজদের ভীড় ছাড়াও রাস্তার পথিক তাঁকে ঘিরে ধরেছে। কলকাতায়

এইভাবে ভীড় বেড়ে ওঠা খুবই সাধারণ দৃশ্য, কয়েকটি মানুষের মাথা একত্রিত দেখলেই কৌতুহলে-ভরা নতুন মাথাও কাছে এসে যায়। রকবাজদের মধ্যে হঠাৎ একজন মিঃ পাকড়াশীর ঘাড় টিপে ধরে মাথা নীচু করিয়ে দিয়ে বললে ভাল করে ছাখ, কোটের তলায় অন্য কোট আছে কিনা।

এইটুকুতেই চাঁদা করে মারের ব্যবস্থা প্রায় হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর কপাল ভাল, মিঃ পাকড়াশীর কাছ থেকে ডেঁপোর দল হঠাৎ কি ভেবে উপে গেল। বোধহয় কোন পুলিস ভীড়ের কারণ জানার জন্য এগিয়ে আসছিল। খোঁজ নেবার অবকাশ তখন মিঃ পাকড়াশীর ছিল না। তিনি জানতেন, মার থেকে পরিত্রাণ পেলেও পুলিশ তাঁকেও টেনে নিয়ে যাবে থানায়, কাজেই যারা ছুটে পালাল তাদেরকেই মহাজন ভেবে দৌড়ের পথানুসরণ করলেন।

মিঃ পাকড়াশী ঘরে পৌছতে মেসের লোকেরা তাঁর এই অবস্থার কারণ জানার জন্য সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই তাঁকে বলতে হল, আর বল কেন? একেবারে গাড়ি চাপা।

গাড়ি চাপা দেওয়ার পর মানুষের দেহে কিছু হয় না, চাকার আলগোছে ছোয়ায় কেবল জামাকাপড় ছেড়ে, এমন পালকের মত হালকা ওজন হাওয়ায় গড়া পুষ্পরথের খবর কারুরই জানা ছিল না। কাজে কাজেই পরস্পরের মধ্যে কৌতুকপুর্ণ সপ্রশ্ন দৃষ্টির আদান-প্রদান শুরু হল।

মিঃ পাকড়াশী ঐ চাহনীর গভীর অর্থ উপলব্ধি করে বললেন, গাড়ির কথা বলতে হল বাজে জিজ্ঞাসাকে চাপা দেওয়ার জন্য। বোঝ না, দেওয়ালেরও কান আছে? এসব কথা শুনতে হলে স্থান কাল বিচার করে এগুতে হয়। তোমরা তো জানো না আমার সম্বন্ধে ছোট বড় সব ঘটনাই দৈনিক কাগজের খবর। রিপোর্টাররা কান পেতেই থাকে। বুঝতেই পারছ, ওরা একবার খবর পেলে আর রক্ষে আছে? যা শুনবে, তাকে মনোমত করে সাজাবে তো

বটেই, তারপর খবর পরিবেশনের সময় হাতযশের ফলে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে দিয়ে যা ঘটেনি, তাই ঘটিয়ে ছাড়বে।

আমার জামাকাপড়ের অবস্থা দেখে ভাবছ অমনটি হল কেমন করে ? হবে না ? ছোটলোক কি আর গাছে ফলে ? ওরা জিনিয়াসের মতই জন্মায় পুলিশ ও ভোঁতার ব্যালেন্স রাখতে হলে ওদের দরকার আছে মানি, তবে আজকের ব্যাপারে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। দল-বাঁধা ব্রুট ফোর্সের কাজে এ-রকমটি ঘটায় অশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু বাছাধনরা ঘুঘু দেখেছিল ফাঁদ দেখেনি আমি যে আধ্যাত্মিক গ্যাস সঙ্গে নিয়ে ঘুরি সে খবর ওরা জানত না। ওরা সকলে মিলে আমার উপর পাশবিক পীড়ন চালাবার জন্য এগিয়ে এল। একদলের টানে একদিকে হেলে পড়ি তো অপরদিক টেনে তাদের দিকে নিয়ে যায়। দেখতে দেখতে টানের দড়ি গেল ছিঁড়ে। দড়ি টানে আমার কোটের একদিককার হাতা চলে গেল জোরদার দলের দিকে। আমি সামলাতে না পেরে বসে পড়লাম বড় রাস্তার মাঝখানে। অবস্থার ফেরে স্পিরিচুয়াল শক্তির শরণ না করে পারলাম না। চক্ষু অর্দ্ধমুদিত করে ধ্যানস্থ হয়ে গেলাম। সমাধিস্থ যোগীর উপর পাশবিক অত্যাচার দেখে ভীড় বেড়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে নবাগতদের মধ্যে আনকেই ভক্তের দিক নেওয়ায় দুর্বল পীড়নকারীর দল কর্পূরের মত উপে গেল। সুতরাং বুঝতেই পারছ রকবাজদের দল বড় হলেও আমার উর্দ্ধলোক থেকে দেওয়া শান্ত-শক্তি যে বল দিল তাতে ভিতর থেকে আধ্যাত্মিক আদেশে রকবাজদের হটিয়ে দিলাম। এখন যাই, জামা কাপড় ছাড়ি।

সেদিন দেখা গেল প্রফেসর প্রেসিডেণ্টের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন আটপৌরে বলতে এখানে কিছু নেই। সবই সাজানো, এমন কি মানুষগুলো পর্যন্ত সুসজ্জিত বেজায় বড় বাড়ি, তারই ভিতর পাথরের নুড়ি ছাড়ানো প্রশস্ত রাস্তা। রাস্তার শেষে গাড়ি-বারন্দা, যেখানে সর্বদাই আগন্তককে স্বাগত জানাবার জন্য সুসজ্জিত খানসামা অপেক্ষায় থাকে। বিরাট বিস্ময়কর ঐশ্বর্যের সমাবেশ,

তারই মাঝে গিয়ে পড়লেন প্রফেসর। খানসামা দেখিয়ে দিল অতিথির আসন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট এলেন এবং নমস্কারান্তে প্রফেসরের পাশের মখমলে মোড়া বেজাই নরম স্প্রিং-যুক্ত সোফায় বসলেন। কথা শুরু হল প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কি মনে করে?

প্রফেসর: শুনলাম, পালা করে ঘর বদলের নিয়মে এবার আমাদের দ্বিতীয় বৈঠক শ্রীমতী মহাশ্বেতার বাড়িতে হবে? খুবই ভাল কথা। কিন্তু সকলের বাড়িতে আপনাদের মত লোকের উপযুক্ত অভ্যর্থনা সম্ভব নয়। তাই বলি আমাদের সমিতির বৈঠক পালার হিসাবে ঘর বদল না করে কোন এক জায়গায় স্থায়ী ব্যবস্থা করতে পারলে খুবই ভাল হয়।

প্রেসিডেন্ট: আমিও কিছুদিন ধরে এই রকমটি ভাবছিলাম। আর না ভেবে বা করি কি? আমাদের সোসাইটিতে পরকীয়া কাল্ট যেভাবে প্রগ্রেসিভ হয়ে উঠছে তাতে ঘর বদল তো সামান্য কথা, বৌ বদল হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। এক কথায় ড্যামেজড্ সোল রিপেয়ারের কারখানা না হয়ে ওঠে। এই কারখানাকে স্পেশাল ম্যাট্রিমোনিয়াল ব্যুরো বললেই মানায় ভাল। কারণ ভগ্নহৃদয় সারাতে গিয়ে মেম্বারদের মধ্যে কে কখন কার গলায় ঝুলে পড়বে তারও স্থিরতা নেই। বিয়ে হলেই তো একজনের মতে সব কিছু সহজ ভাবে চলা সম্ভব নয়; তবে বিয়ের আগে দিনক্ষণ দেখে ডাইভোর্সের ব্যবস্থাটাও পাকা হয়ে থাকলে আমাদের প্রোগ্রামকে শৃংখলার মধ্যে আনা যেতে পারে।

প্রফেসর: এই ইঙ্গিতটা কি মিস ফিফি ছাড়া আর কারুর উপর আছে নাকি? আপনি অপর কারও স্বার্থের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন কেন?

প্রেসিডেন্ট: দিব্যদৃষ্টি থেকে প্রফেসর, দিব্যদৃষ্টি থেকে। আমি চোখে ভালই দেখি, কানেও বেশ ভালই শুনি, এর উপর কানাঘুষো

তো আছেই। যাক, আপনার হৃদয়ের জন্য আগে ভাগেই কন্‌গ্র্যাচুলেশন জমা রইল।

প্রফেসর: লোকে বলে আপনি টাকার কুমীর, আর আমি তো দেখছি, আপনি একটি রসের আড়ৎ।

প্রেসিডেন্ট: যা অনুমান করেছিলেম তা মনে হচ্ছে আপনি স্বীকার করে নিলেন। তবে জখমের চিকিৎসাটা কোন্ শাস্ত্র মতে হবে সেটা জানতে পারলে সোসাইটির তরফ থেকে জল্‌দি আরামের আয়োজন করা যেতে পারে।

প্রফেসর: আপনি যেভাবে অদল-বদলের আশঙ্কা ঢুকিয়ে দিলেন তাতে কে কাকে এবং কতটা ঘায়েল করবে তা না জানা পর্যন্ত চিকিৎসার কথা বলতে পারছি না। যাক, কাজের কথায় ফিরে আসি। সোসাইটির স্থায়ী ঘর সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করলাম সে বিষয়ে একটু আশা দিন, তা নইলে আমি কেন, আপনাদের সেই কবি পাকড়াশী সাহেবের অসুবিধা আরও বেড়ে যাবে; কারণ শুনেছি ও কখন কোথায় থাকে তার স্থিরতা নেই।

প্রেসিডেন্ট: আপনি যে একেবারে কনডাক্টের কথাই তুলে ফেললেন। তাহলে এ-বিষয়ে তো খবর নিতে হয়, পরকীয়া কালচারে পারসোন্যাল কনডাক্ট বিশেষভাবে দেখা দরকার। আর চরিত্র সম্বন্ধেও আমরা প্রগ্রেসিভ কালচারের এক আদর্শ মেনে থাকি, যে আদর্শ নির্দিষ্ট এবং শর্তহীন। আরও স্পষ্ট ভাষায় দাঁড়ায়, শর্তের নির্দেশে হাতবদল আড়াইবারের বেশী নিষিদ্ধ।

প্রফেসর: আড়াইবার? আধখানা আসছে কোথা থেকে।

প্রেসিডেন্ট: স্যার, আপনি প্রফেসর মানুষ, এইটুকু হিসাব রাখতে পারলেন না? আধখানা ফাউ।

প্রফেসর: এই ফাউ চাইলেই পাওয়া যায়?

প্রেসিডেন্ট: ও-কথা উঠবে চাইবার পদ্ধতিবিচার করে। কথার মোড় ফেরাই। আমি এখন সোসাইটির স্থায়ী ঘরের জন্য ভাবছি। আচ্ছা, অমুক জায়গায় সেই বাড়িটা কিনে ফেললে কেমন হয়?

বাড়িটা বেশ বড় এবং দোতলা। উপর নীচের থাকার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ আলাদা। তাছাড়া বেশ খানিকটা লন আছে। পার্টি দিতে হলে লনটি বিশেষভাবে কাজে আসবে। উপরতলার ভাড়া থেকে সোসাইটির খরচও কতকটা উঠে আসবে, আর বাকীটা আসবে ডাইভোর্সের ট্যাক্স থেকে। এই ট্যাক্সের টাকাটাই আমাদের নিশ্চিত ইনকামের মধ্যে ধরা যেতে পারে, তাছাড়া মেম্বারদের চাঁদা তো কখনও-সখনও পাওয়া যাবেই।

প্রফেসর : যে বাড়ির বর্ণনা আপনি দিলেন, তার দাম দেবে কে? আমাদের সব ক'জনকে বিক্রী করলেও আশা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই।

প্রেসিডেণ্ট : মানুষের দাম তো আর মাংসের ওজনদরে বেচা চলে না। এক কথাতেই আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফেলি। বাড়িটা আমিই কিনব ঠিক করে ফেলেছি এবং লেখাপড়া করেই আমাদের সোসাইটিকে নীচের তলা অতি নগণ্য ভাড়ায় ছেড়ে দেব, অবশ্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভাড়ার মেয়াদ থাকবে। এবং পার্টি ইত্যাদি আনন্দের খরচ আলাদা করে রাখতে হবে, যাতে ডাইভোর্সের ট্যাক্স থেকেই ওটা সরবরাহ করা চলে।

প্রফেসর : নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন শর্ত থাকবে না কি?

প্রেসিডেণ্ট : নিশ্চয়। শর্ত আগেই বলেছি, আড়াইকে জড়িয়ে।

প্রফেসর : আচ্ছা, অপনি যে দেখছি বিয়ের চেয়ে ডাইভোর্স-টাকেই পাকা করে ফেললেন। আপনার ঐ আধখানা ফাউয়ের দাবীও কি এই জাতীয় পাকার দিকে গড়াবে নাকি?

প্রেসিডেণ্ট : বলা যায় না।

প্রফেসর : আপনার শূণ্যমার্কা তাগ্‌মারীর মতই ফাউয়ের ব্যাপারে আমি বলতে পারি 'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল' অন্তত আমার দিকটা গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেলের মতই হয়ে আছে। শিকারীর কথাতেই বলি, মাছকে খেলিয়ে পাড়ে তোলার জন্যে ফাৎনা নাড়া দেখে ঠিক সময়ে বঁড়শি গাঁথার টান জানা দরকার,

যাতে শেষ পর্যন্ত সুতো কেটে টোপ খাওয়া মাছ বঁড়শি না নিয়ে পালায়। এদিক দিয়েও নিজের গুণ জাহির করার মত কিছু নেই, সুতরাং আপনি যা ভাবছেন, তাও আমার পক্ষে শূন্যে ঝোলার মত।

প্রেসিডেন্ট : তবে কি কানাঘুষোর কথাটা ল্যাজে খেলানোর মধ্যে পড়ল নাকি?

প্রফেসর : খেলাচ্ছে ভালই, তবে শেষ পর্যন্ত সুতো কেটে বঁড়শি না ছেঁড়ে।

প্রেসিডেন্ট : বঁড়শির কথা যখন তুললেন তখন বোঝা যাচ্ছে মাছ টোপ গিলেছে। অতএব জলেই ঝাঁপ মারুন কিম্বা ডাঙাতেই সাঁতার কাটুন, শেষ পর্যন্ত দম যদি না ফুরোয় তাহলে মাছ সুতোর টানের অনুসরণ করবেই। আমি ভাবছি, শুভকার্যটি আমাদের নূতন স্থায়ী আড্ডায় হবে না কেন?

প্রফেসর : সাধু, সাধু। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। এতটা বলেই কব্জী ঘড়ির দিকে তাকালেন, তারপর একটু সলজ্জভাবেই জানালেন, কথা দিয়েছি কাঁঠালগাছের তলাতে আজই যাব। সময় হয়ে এল, আপনার শুভেচ্ছা পকেটে নিয়েই যাব, যাতে কাঁঠাল খসে পকেটে না পড়ে।

প্রেসিডেন্ট : আপনি যেভাবে কথা বলছেন, তাতে অনুমান করা চলে আপনি অস্কার ওয়াইল্ডের মতই জিনিয়াসকে পকেটে পুরে রেখেছেন। দেখুন, ধরপাকড়ের খানাতল্লাসীতে টিকে যান কিনা। তা সময় তো সন্ধ্যা পার হল, এবার ধর্মে-কর্মে নামুন। সানডাউন এর ধর্মটা রক্ষা করবেন না। এতটা বলে প্রেসিডেন্ট বৈদ্যুতিক ঘণ্টা টিপলেন।

এবার নতুন খানসামা এসে উপস্থিত হল। ধুতির বালাই নেই, ধোপদুরস্ত চুড়িদার পায়জামা ও কালো মোটা পশমের গলাবন্ধ আচকান ও মাথায় যোধপুরী ঢং-এ কান ঢাকা পাগড়ীপরা আজ্ঞা-বাহী ঘরে ঢুকেই সেলাম দিয়ে দাঁড়াল। প্রেসিডেন্ট আদেশ করলেন

ড্রিঙ্কস। খানসামা চলে গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই আর একজন চাকা-যুক্ত গড়ানে বাঁটকুল টেবিলের উপর নানা গঠনের বোতল ও সুরাপাত্র এবং সোডা সাইফুন নিয়ে উপস্থিত হল।

প্রেসিডেণ্ট: আপনার পেয়ারের বোতলটা দেখিয়ে দিন। ট্রেতে হুইস্কি, জিন, ব্রাণ্ডি, রাম সব ক'টা কড়া তরলই আছে নেই কেবল কোমলাঙ্গীদের ড্রিঙ্কস, যেমন-স্যাম্পেন, ক্লারেট পোর্ট, সুইট ওয়াইন ইত্যাদি।

প্রফেসর হুইস্কির বোতল তুলে গেলাসে ঢালতে যাচ্ছেন দেখে প্রেসিডেণ্ট বললেন, আপনি কষ্ট করছেন কেন? লোকটা আপনার সেবার জন্যই দাঁড়িয়ে।

প্রফেসর: পুণ্যকর্মে তৃতীয় ব্যক্তিকে ভাগ বসাতে দিলে 'সে হোয়েন' এর কথাটা বিবেককে নির্দয়ভাবে নাড়া দিতে থাকে। রসগ্রহণের গোড়াতেই হোয়েন কথাটা মোটেই শ্রুতিমধুর নয়। তাই বিচার করে দেখলাম, সাধনায় সাধকেরই সব কিছু নিজে গুছিয়ে নেওয়া ভাল। এতটা বলার পর প্রফেসর যেভাবে আসল দিয়ে পান পাত্রটি পূর্ণ করলেন তাতে সোডা মেশাবার আর স্থান রইল না।

প্রেসিডেণ্ট: এতটা নিট্ নিলেন? গেলাস যে উপ্‌চে পড়ার যোগাড়।

প্রফেসর: সোডা মেশালে অযথা খরচ বাড়ে। স্বজ্ঞানে অমন অপকর্ম আমার দ্বারা সম্ভব নয়। হিসাবে গলদ আসার সম্ভাবনা থাকায় পাত্রটি কানায় কানায় ভরে নিতে হল। দেখছেন না, প্রথম গেলাসের আকার অন্যায় ভাবে ছোট, তার উপর নীচের দিকটা সরু।

প্রেসিডেণ্ট: এখানেও আপনার পায়ের তলায় একটা গালিচা আছে। ওটা দুর্লভ সঞ্চয়। দেখবেন, পরের হেল্পিং-এ গেলাস যেন টলে না যায়।

প্রফেসর: স্যার আমার ক্ষেত্রে গেলাস টলে না, গেলাস বোতলকে টলায়; সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আপনার

সুন্দর গালিচা পায়ের তলায় থাকলেও গেলাস টলে রূপের বেইজ্জৎ করবে না। তলায় যা-ই থাক, তাকে সুন্দর হলে মর্যাদা দেবার জন্য সব দিক সামলে নিতে পারব। সুন্দরীর নিটোল নধর পদযুগলে যখন পাঁয়জোর দেখি, তখন কি পায়ে ছোঁয়া অলঙ্কার বলে তাচ্ছিল্য করি? তখন যে এক সুন্দর আর এক সুন্দরকে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে থাকে।

প্রেসিডেন্ট: হুইস্কি অন্তরস্পর্শী হবার আগেই যে দেখছি আপনি কল্পনার দিকে অগ্রসর হয়ে পড়েছেন।

প্রফেসর: কল্পনার তাড়া খেয়েই তো নিটের সঙ্গে আত্মার যোগ ঘটাচ্ছি। আপনার কৃপা আর আমার হাতযশ কাজে লাগলে কাঁঠালের আঠায় তেজ কতটা বুঝে নেবার সুবিধা পাওয়া যাবে।

হুইস্কির পুর্ণ গ্লাশ থেকে গালভরা চুমুক গলাধঃকরণের পর প্রফেসর পরম তৃপ্তির সঙ্গে বললেন একেই বলে স্বর্গের সুধা। বিলাতী কিকের মাহাত্মই আলাদা। ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাকে পর্যন্ত আনন্দে নাচিয়ে ছাড়ে। নৃত্যের তালে মনে হচ্ছে সোবার হয়ে আসছি। এখন যে কোন কালচার সম্বন্ধে নিজেকে অথরিটি ভাবার কিছুমাত্র অসুবিধা দেখছি না।

প্রেসিডেন্ট বললেন, বিলাতে ভাল জিনিসের অভাব নেই জানি, তবে বিলাতী কিক-ও যে আরামপ্রদ হতে পারে এমন কথা শুনিনি। ভাবছি, আপনার তুলনাহীন অভিজ্ঞতা সোসাইটির আগামী আলোচনায় অ্যাজেণ্ডায় রাখলে কেমন হয়। সভ্যদের মাঝে কিক-জাত উচ্ছ্বাস গভীর তত্ত্বে নামিয়ে দিলে ভাবাবেগ অনেক কিছুই তুলিয়ে ছাড়বে। কাঁঠালের কথাও ভুলবেন, গোঁফের তেলও বেকার হয়ে যাবে। একটু আগেই যেভাবে কব্জী-ঘড়ি দেখলেন এবং কাঁঠাল সম্বন্ধে নানা সম্ভাবনার কথা শোনালেন, তাতে মনে হয় আপনার সময়ের উপর আর একজনের দাবী আছে। তাঁকে পাওনা থেকে বঞ্চিত করলে তিনি অভিশাপ না দিয়ে বসেন।

প্রফেসর : আপনি কিছুমাত্র বিচলিত হবেন না। দ্বিতীয় সাহায্যকারীর সঙ্গে ছোঁয়া লাগলে দেখবেন, আমি যে কোন অভিশাপকে হজম করে ফেলেছি। যাক, কাজের কথায় ফিরে আসি। আমার ইচ্ছা ছিল বৃহত্তর কালচার সম্বন্ধে কিছু বলি।

প্রেসিডেন্ট : আমি তো বাধা দিইনি।

প্রফেসর : আপনি যেভাবে কিকের ঠোক্কর দিলেন।

প্রেসিডেন্ট : উপাদেয় ঠোক্করের উপর আপনার যে বীতরাগ আসবে এমনটি ভাবতেই পারিনি। আর ওটাতো গুণবিশিষ্ট কিক। আপনিই গুণকে আরামপ্রদ করলেন, আর আরামের ঠোক্করে আপনার ব্যাথা লাগল ?

প্রফেসর : তা স্যার, কিকই যদি খেলাম তো ভাল করেই খাওয়ান। সোবার ভাবটা কেটে যাচ্ছে ; এটা কাঁঠালতলায় যাবার পক্ষে শুভ লক্ষণ নয়। আমাদের কথা বলার সময় সচল বেঁটে টেবিলটা কখন যে অন্তর্ধান করল বুঝতেই পারিনি।

প্রেসিডেন্ট ঘণ্টা টিপলেন। প্রফেসর যা চেয়েছিলেন তার চেয়ে বেশী কিছুই উপস্থিত হল। চলন্ত ট্রে এবার ভিন্ন আকর্ষণে পূর্ণ। কাট গ্লাসের ডিকেন্টারে রক্ষিত প্রফেসারের প্রিয় পানীয় ছাড়া নানা রকমের স্ন্যাকস্, সসেজ, চিকেন, মাটন্, প্যাটি চিকেন রোলস্, স্বদেশী গরম শিক্-কাবাব, চিংড়ি-ভাজা এমন কি ডালমুট পর্যন্তও বাদ পড়েনি। প্রফেসর 'ভরপুর' গেলাসে জবরদস্ত্ চুমুক দিয়ে হাত বাড়ালেন স্ন্যাক্স-এর দিকে। খাদ্য বাছাই সম্বন্ধে দেশী বিলাতীর মধ্যে কোন বিবাদ হতে দিলেন না। যা সামনে পেলেন তাকেই সমাদরে এবং দ্রুত যথাস্থানে চালান করে দিতে লাগলেন। একসঙ্গে গোটা কয়েক শিক্-কাবাবের সঙ্গে একটি গোটা মাটন্ পার্টির স্থান মুখের ভিতর না থাকায়, প্রফেসর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে গহ্বরস্থিত খাদ্যের বাহিরে আসার পথ রুদ্ধ করে রাখলেন। কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে মুখদ্বার রুদ্ধ করে রাখলে কি হয়, যতই প্রফেসর পথভ্রান্ত অন্নকে আঙুলের সাহায্যে ভিতরে ঢোকানোর জন্য বলপ্রয়োগ

করেন, ততই ভিতর ও বাহিরের মধ্যে দাঙ্গার সূচনা বেড়ে ওঠে। গোটা তালু দিয়ে মুখ ঢাকলেও বাধা দান কাজে আসতে চায় না। শেষ পর্যন্ত খানিকটা বহির্গত উচ্ছিষ্টের অংশ প্রফেসর তালুর উপর রেখে ভিতর ও বাহিরের গোল মেটালেন।

প্রেসিডেন্ট সাহেব প্রগতিশীল কৃষ্টিসাধনের দৃষ্টান্ত দেখে বেয়ারাকে একটি বড় দেখে পিতলের ফুলদানী নিয়ে আসতে বললেন। পিকদানীর পরিবর্তে ফুলদানী আনতে হল, কারণ এ বাড়িতে প্রথমোক্ত আধারের ব্যবহার বহুদিন আগেই উঠে গিয়েছে। উদ্গীরণের পরিমাণ বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকায় সাবধানতার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠল।

এরপর ফুলদানীর ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকায় অশোভনীয়কে প্রত্যক্ষ করার আগেই ঘটনার সামনে পর্দা টেনে দি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাকড়াশী সাহেব বেকার। প্রেমের অফিসে চাকরি না পেলে ধর্মঘট করেও আশাপ্রদ কিছু পাবার উপায় নেই; তথাপি পাকড়াশীর অধ্যবসায় অন্তরে চলতি শ্লোগান চালাতে লাগল, এ চলবে না, চলবে না। অসম্ভবকেও সম্ভব করার জন্য 'যা থাকে কপালে, তাই হবে' ভেবে পুনরায় মিস ফিফির বাড়িতে যাবেন ঠিক করলেন। 'ধৈর্য ধরা চলবে না, এ চলবে না'র বাণী তাঁর মনকে দৃঢ় করে দিচ্ছিল; কারণ নিশ্চিত বুঝেছিলেন, তিনি ফিফিকে ভালবেসে ফেলেছেন, এ বিষয়ে নড়চড় নেই। ভালবাসার প্রকাশ ঠিক মত হচ্ছে না বলেই ফিফি বুঝতে পারছে না কতটা গভীর তাঁর প্রেম। এখন একথা প্রকাশ করার সুবিধা পেতে হলে বড় পার্টি, উৎসব উপলক্ষে যে কোন মন্দিরের ভিতর অথবা যে কোন সিনেমার প্রেক্ষাগৃহের প্রয়োজন।

সিনেমায় যেতে হলে উপরতলার টিকিট কিনতে হয়। দুজনার জন্য উপরতলার টিকিটের দাম এক কথায় বার করতে গেলে মন

কড়কড় করে ওঠে। তার উপর অগ্রীম সীট রিজার্ভ না করলে ভাল ছবি দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ধড়াচুড়া পরে মিঃ পাকড়াশী বেরিয়ে পড়লেন।

দু-একটা রাস্তার মোড় ফিরে বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছাতে পাকড়াশী সাহেব কুয়াশায় ঢাকা অস্পষ্ট আলোয় দেখলেন, দুটি মহিলা বাস স্ট্যাণ্ডের তলায় দাঁড়িয়ে। স্থানটিতে নানা রকমের মানুষের ভীড়, সকলেই কোথাও যেতে চায়। মহিলার কাছেই একটি অর্ধনগ্ন অতি চালাক পাগল মনে হল ভ্যানিটিব্যাগের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। ভীড়ের আড়াল সরে যেতে কাছে আসায় বোঝা গেল নারী মাত্র একটি। দুটি মাথা দেখেছিলেন, কারণ নবতম কেশবিন্যাসে অতিকায় গ্রীক চালের খোঁপা একটি মাথাকেই ডবলকরেছেড়েছিল। মহিলাটি এদিক ওদিক দৃষ্টিক্ষেপ করছিলেন। যার প্রত্যাশায় ঐ দৃষ্টি, সেকি পার্শ্বচর হতে পারে? মিঃ পাকড়াশী কাছে এসে দাঁড়াতেই নারীর তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি বুঝিয়ে দিল খরিদ্দার এসেছে। মিঃ পাকড়াশীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণের পর যে বাঁকা চাহনী তাঁর চোখের ওপর গিয়ে পড়ল, সে দৃষ্টি কথা বলে, যে কথার মানে রসিক মাত্রই বোঝে। মিঃ পাকড়াশী ধরে নিলেন মহিলা কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না। মুখ ফোটাবার জন্য মিঃ পাকড়াশী আরও একটু কাছে যেতেই নারীর মধ্যে কেমন একটা অস্থিরতা দেখাগেল। মহিলা কানের কাছে এসে বললেন, আমাকে বাঁচান। ওরা আমার পিছু নিয়েছে।

ওরা কারা, তা দেখিয়ে দেওয়া অথবা মিঃ পাকড়াশীর দেখার প্রয়োজন ছিল না। কলকাতার মত রাস্তায় যৌবন ঠাসা কোন মহিলা যদি কাউকে পুরুষ ভেবে বিপদের আশঙ্কা জানান এবং বলেন, আমাকে রক্ষা করুন, তখন অনেকে নিজেকে পুরুষ ভাবায় বেশ গর্ববোধ করে থাকেন। মিঃ পাকড়াশীর দাড়ি গোঁফ থাকায় বীরদর্পে পুরুষের মতই তিনি বললেন, আপনার কিছু ভয় নেই। কোথায় যেতে হবে বলুন? আমি আপনাকে পৌঁছে দেব।

অপর পক্ষ কৃতার্থ হয়েই বললেন, ঐ যে ট্রাম আসছে। আমাকে বিডন স্কোয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দিলেই হবে।

ট্রামের ভিতর ভীড় ছিল না। মিঃ পাকড়াশী বাঞ্ছিতার পাশে বসায় রীতিমত ঘেঁষাঘেঁষির সুবিধা করে নিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে যার নিজের ভাড়া দিয়েই গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবেন, কিন্তু কণ্ডাক্টর ভাড়া চাইতে এলে মহিলাটি জানালা দিয়ে মুখ বার করে দূরদৃষ্টি অভ্যাস করছিলেন। ফলে মিঃ পাকড়াশীকে বাধ্য হয়েই আন্দাজে দুটো বেলগেছিয়ার টিকিট কাটতে হল।

নারীর উদ্ধত যৌবন মনে হল যেন বিস্ফোরণ-মুখী হয়ে উঠেছে, তারই গরম ছোঁয়ায় যে উত্তেজনা ছিল তা মিঃ পাকড়াশীকে অস্থির করে তুলল। পাকড়াশী এইবার মুখোশ পরলেন। নিরীহ প্রশ্ন থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাস্য ক্রমান্বয়ে জটিল হয়ে উঠতে লাগল, যে জটিলতার অর্থ মনে হল খুবই সোজা। ধর্মতলায় ট্রাম বদলী করার আগে উভয়কে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কথা বলতে হয়েছিল। এবং তারপর সিনেমায় যাওয়ার প্রস্তাব কি ভাবে হয়েছিল এবং মহিলাটি নিজের গন্তব্যস্থলে যাওয়ার কথা ভুলে কেন মিঃ পাকড়াশীর সাথী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, তা ঘটনার ক্রমপরিবর্তন থেকেই জানা যাবে। এরপর দুজনকেই দেখা গেল সিনেমা গৃহের দ্বারপথে ভীড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন। কিউ লাগানোর ভীড় ঠেলে টিকিট ঘরের সামনে যেতে হলে মানুষের কাঁধের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়। এটা হনুমানজীর কসরৎ, যা চোখের সামনে একটি ছোট ছেলে দেখিয়ে দিল।

মিঃ পাকড়াশীর পক্ষে এই জাতীয় সার্কাসী বিদ্যা দেখানো সম্ভব নয় বলে কি করবেন তাই ভাবছেন, এমনি সময়ে মহিলা মিঃ পাকড়াশীর একটি হাত চেপে ধরে বললেন, এ যা দেখছি, তাতে আপনি টিকিট কিনতে পারবেন না। কিউ ভাঙার কারবার আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি। টাকাটা আমায় দিন।

মিঃ পাকড়াশীর মনে হল, যা তিনি চাইছেন তা পেতে আর

বিলম্ব নেই। কালক্ষেপ না করে মিঃ পাকড়াশী চার টাকার নোট মহিলাকে দিয়ে দিলেন এবং দেখলেন অবলীলাক্রমে তিনি ভীড়ের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

মিঃ পাকড়াশী দাঁড়িয়ে আছেন। ইতিমধ্যে সিনেমা আরম্ভ হওয়ার ওয়ার্নিং বেল শোনা গেল। কই, মহিলাটি তো ফিরলেন না। অতি আপনার কেউ যেন হারিয়ে গিয়েছে এইভাবে মিঃ পাকড়াশী এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলেন। ঘণ্টা বাজার পর টিকিট ঘরের সামনেটা তখন প্রায় লোকহীন হয়ে গিয়েছে। এই সময় সেই মহিলা কোথা থেকে এমন ভাবে মিঃ পাকড়াশীর সামনে উপস্থিত হলেন, যাতে মনে হয় কোন দুর্দান্ত গুণ্ডার কাছ থেকে আত্মরক্ষা করে কোন প্রকারে ত্রাণকারীর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। পাকড়াশী উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন কি হল? টিকিট কৈ?

মহিলা: প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি, এইটুকুই যথেষ্ট।

পাকড়াশী: কি হয়েছিল বলুন দেখি, আমি যদি কিছু করতে পারি।

মহিলা: কিছুই করবার নেই। তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলুন। সেই লোকগুলো, যারা আমার পিছু নিয়েছিল তারাই সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে গেল। এখনও নিশ্চয়ই তারা কোন ঘুপচির মধ্যে লুকিয়ে আছে। চলুন, তাড়াতাড়ি চলুন। ঐ যে রিকৃশা ডাকুন ডাকুন।

রিকৃশা ডাকতে হল না, রিকৃশাওয়ালা নিজেই হাজির হল। সে যেন জানত, তার ডাক পড়বে। তাড়াতাড়ি রিকৃশায় উঠে মহিলাটি পাকড়াশীকে বললেন, সামনের পর্দাটা ফেলে দিতে বলুন।

এই সময় পাকড়াশীর মানসিক অবস্থা কি হয়েছিল, তা তার নাড়ী না দেখলে বোঝা অসম্ভব। ক্ষুধার্ত মন, হাতকে কিছুর সন্ধানে এমন ভাবে ক্ষেপিয়ে দিল যে তার গতিকে রোখা পাকড়াশীর

সাধ্যাতীত হয়ে গেল। মহিলা বললেন, ছিঃ! এত আলোয়? আমরা তো চলেছি ঐ গলির ভিতরটায়। ঐখানেই আমার বাড়ি।

অন্ধকারের আশায় বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, রিকশা-ওয়ালা মোড় ফিরল নির্দিষ্ট গলির দিকে। আর রিকশা গলির খানিকটা ভিতর ঢুকতেই পর্দার আড়াল থেকে মহিলা চাপা গলায় বলতে লাগলেন, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! পরক্ষণেই হঠাৎ এমন-ভাবেই হাত পা ছুঁড়ে করুণ চিৎকার করতে লাগলেন যে, মনে হয় কেউ যেন মহিলার গলা টিপে ধরে শ্বাসরোধ করার জন্য প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করছে।

ব্যাপারটা এমনই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত যে পাকড়াশী হতভম্বের মত হয়ে গিয়েছিলেন। কি হয়েছে জানার আগেই রিকশার দুপাশ থেকে কয়েকজন ভদ্রবেশী মানুষ চলন্ত রিকশার গতিরোধ করে দাঁড়াল এবং জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে। তারপর যা হয়ে থাকে তাই ঘটল। নারীকে নির্যাতন থেকে উদ্ধার করার পর পূর্ব-নির্দেশ অনুসারে অপহরণের কাজটাও দুর্বৃত্তরা মহিলার সম্মতিক্রমেই সেরে ফেলল। যারা রিকশার কাছে রয়ে গেল তারাও অদৃশ্য প্রভুর আদেশ অনুসারে পাকড়াশীর কব্জী ঘড়ি থেকে আরম্ভ করে যে পকেটে যা পেল তাই সংগ্রহ করে পাকড়াশীকে ধাক্কা মেরে রিকশা থেকে ফেলে দিল। এবং পরক্ষণেই রিকশা চালকও উধাও হয়ে গেল। পাকড়াশী তখন আছাড়ের টাল সামলে কোন প্রকারে দাঁড়িয়েই দেখে নিলেন বেল্টের গোপন জায়গায় লুকানো টাকা ঠিকই আছে। এই সময় বড় রাস্তার দিক থেকে পাহারাওয়ালা অতি বৃহৎ লাঠি হাতে পাকড়াশীর সামনে এসে হাজির, এবং কাছে আসতেই চেনা গন্ধ বুঝিয়ে দিল যে লোকটা মদ খেয়েছে। এইবার পাহারাওয়ালার কর্তব্যে এল মাতাল মারার পালা। দাড়ির বাহারে যে খরচা হয়েছে তাতে দাড়ির মালিককে ভদ্রলোক ভাবা চলে এবং ধারণাকে

লাভজনক করতে হলে থানায় যাবার আগেই কাজটা সেরে ফেলতে হয়। কিন্তু পাহারাওয়ালা যথারীতি এগিয়ে এসে বুঝল, সে ফাঁকিতে পড়েছে। ফলে পাহারাওয়ালা তাকে টান মারতে মারতে ফাঁকি দেওয়ার শাস্তির জন্য পাকড়াশীকে নিয়ে গেল থানায়।

পরের ঘটনা। হাজত বাস পাকড়াশীর মনঃপুত হয়েছিল বলে মনে হয় না, তথাপি মাতালের খ্যাতি থানায় নথীবদ্ধ হওয়ার পর তাঁকে নিশ্চিন্ত মনে হাজতে বাইরে ঘুরে বেড়াতে দেখে মেসবাসীদের মধ্যে কয়েকজন কারণ জানার জন্য পাকড়াশীকে উদ্ব্যস্ত করে তুলেছিল। ওদের সন্দেহকে ফাঁকি দেওয়ার প্রয়োজন থাকায় পাকড়াশী জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, থানায় গিয়ে ছিলেন বটে কিন্তু সেইখানের রাজকর্মচারীদের অপকর্মের জন্য তাদেরকে এমন ধমকই দিয়েছিলেন যে তারা নিজেদের ত্রুটি তো বুঝলই তার উপর বাপ বাপ করে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও করে দিল। কিন্তু পাকড়াশীর হাজত থেকে খালাস পাওয়া সম্বন্ধে আসল খবর আমরা যা পেয়েছিলাম, তাতে পাকড়াশী পিঠের উপর কয়েক ঘা উত্তম-মধ্যম মারের সহিত গলাধাক্কা খাওয়ার পর করজোড়ে টেলিফোন করার অনুমতি পেয়েছিলেন, এবং এই সুবিধাটি পাওয়ায় প্রেসিডেন্টের নিকটে কৃপাপ্রার্থী হতে হয়েছিল।

প্রেসিডেন্টের কৃপায় হাজত বাস থেকে অব্যাহতি পাওয়ায়, তার সামনে অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য মিঃ পাকড়াশী অস্থির হয়েছিলেন। উচ্ছ্বাস অদমনীয় হওয়ায় দ্বিধার বাধা অতিক্রম করে যখন করুণাময়ের প্রাসাদোপম আবাসে উপস্থিত হলেন, তখন সান-ডাউনের সাঙ্কেতিক নির্দেশ পাকড়াশীর ঘাড়ে এসে চেপেছে। পাকড়াশী জানতেন তার অবস্থা জেনে প্রেসিডেন্ট নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ দর্শন দানে তাকে চাপরাশির হাতে তুলে দেবেন না। কিন্তু পাকড়াশী গাড়ি বারান্দার প্রবেশ পথে দেখলেন অভ্যর্থনার জন্য মাইনে করা মানুষ দাঁড়িয়ে থাকলেও সে আপন

কর্তব্য সম্বন্ধে নির্বিকার। অটল সজীব ভৃত্যগুলির নির্লিপ্ত অবস্থা দেখে পাকড়াশী কিছু একটা ফেলে এসেছেন, এইভাবে দেখিয়ে একেবারে রাইট অ্যাবাউট টার্ণ করে পুনরায় বড় রাস্তায় এসে পড়লেন।

কিক্ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে প্রফেসর এক্স কিছু বলবেন, এই মর্মে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সমিতির সভ্যেরা নোটিশ পাওয়ায় অনেকেই তাঁর ভাষণ শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। মহাশ্বেতার বসতবাড়ির প্রশস্ত ড্রইংরুমে সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে আগন্তুকদের আবির্ভাবে পরিবেশ সরগরম।

নোটিশ জারীর সূত্র বিলাতী কিকের গুণকীর্তন অবলম্বনে। রসিকতা করতে গিয়ে প্রেসিডেন্টের সামনে গুণবিশিষ্ট কিকের পদমর্যাদার কথা ওঠে; তার ফলে পদাঘাতের বিশদ বিবরণ সভার মাঝে আলোচ্য বিষয় হবে এমনটি প্রফেসর ভাবতে পারেননি। মিটিং-এর অ্যাজেণ্ডায় প্রথমেই কিক্ সম্বন্ধে আলোচনার উল্লেখ থাকায় প্রফেসর প্রস্তুতির উপযুক্ত মনোভাব সংগ্রহ করতে পারছিলেন না। খুবই স্বাভাবিক। কারণ কিকের মত রুখে ওঠা বক্তব্যকে শ্রুতিমধুর করতে হলে ন্যাকাইজম্-এর মত ছোঁয়াচে রোগকে দূরে রাখতে হয়। ছোঁয়াচে রোগের আকর্ষণ থেকে রক্ষা পেতে হলে একমাত্র উপায় হল বিলাতী খাঁটির তোয়াজ। এইরূপ অবস্থায় মিঃ প্রেসিডেন্টের শরণাপন্ন না হয়ে উপায় নেই। সহজ কয়েকটি কথায় তুলনামূলক দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে ছোট গায়ক যদি গলা কাঁপিয়ে কথাহীন কণ্ঠধ্বনি শোনাবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় স্পেশাল ট্রিটমেন্ট পায়, তাহলে ইন্টেলেকচুয়াল ভাষণের জন্য প্রফেসর প্রয়োজনীয়কে পাবেন না কেন? সেদিন সভা আরম্ভ হবার আগেই মিশিরজীকে যে রসে মশগুল করা হয়েছিল তার যৎকিঞ্চিৎ পেলেই উপস্থিত চলে যাবে।

প্রেসিডেন্ট: কিঞ্চিৎ যে আপনার ধাতে সয় না, তা জানি বলেই আমিও আপনার মঙ্গল কামনায় চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

যাঁর উপর আজ অতিথি সংকারের ভার পড়েছে, তিনি বিধর্মীর কতটা সহায় হবেন বলতে পারি না।

প্রেসিডেন্টের কথা শেষ হবার আগেই মহাশ্বেতা বললেন, ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি সব বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা করি; তবে পূজার উপকরণ এবং উদ্দেশ্য শাস্ত্রসম্মত হলেই হল। আপনার কুলদেবতার নাম জানতে পারলে পূজার আয়োজন করতে পারি।

প্রেসিডেন্ট: কিক্।

মহাশ্বেতা: সে কি? কিক্ আবার দেবতা নাকি?

প্রেসিডেন্ট: নিষ্ঠা থাকলে কিক্ও পূজ্য হয়ে থাকে। কিক্ কেন? বিশ্বাসের কথা যখন উঠল, তখন গুণ থাকুক না থাকুক ঘাস, বেলগাছ, অশ্বত্থগাছ, মনসাগাছ, অদৃশ্য প্রেতলোক-বাসীও কাল্পনিক শক্তিদানে বিশ্ববাসীর সহায় হয়ে থাকে। এমন কি বিষধর সাপও পূজ্য। আসল কথা, যে কারণে বস্তুগুলি পূজ্য সে কারণ মানুষেরই দেওয়া।

মহাশ্বেতা: আপনার সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি। আপনাদের ঘরোয়া কথোপকথন সবই তো বলেছেন, অতএব এখানে যা বলার আছে তা উনিই বলবেন। আপনি থামুন। আসল কথা চাপা পড়ে গেল।

প্রেসিডেন্ট: আরে ভাল কথায় বাধা দাও কেন? আসলে উনি লাজুক মানুষ। ওনার হয়ে আমিই বলি, হুইস্কি এ্যাণ্ড সোডা।

লিলি: ল্যাভলি। তাহলে ফিফির ডিস্টিঙ্গুয়িসড্ ফিঁয়াসের জন্যও ব্যবস্থা কর ভাই।

প্রেসিডেন্ট: তাহলে এইবার প্রফেসরের ভাষণ শুরু হোক। আজকের আলোচনায় প্রফেসর 'কিক্ মাহাত্ম' সম্বন্ধে কিছু বলবেন। আপনারা সকলেই প্রফেসরের খ্যাতি শুনেছেন, সুতরাং নতুন করে তাঁর পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না।

প্রফেসর: আজকের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আমাকে বিশেষজ্ঞ ভাবা হল কেন তা মিস্টার প্রেসিডেন্টই জানেন। যাই হোক,

খ্যাতনামার পদে অভিষিক্ত হওয়ায় মিস্টার প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানাই; তার সঙ্গে বলে রাখি, কিকের গুণকীর্তন সম্বন্ধে মিস্টার প্রেসিডেন্ট যা বললেন, তাতে দ্বিমত হবার উপায় নেই এবং মহাশ্বেতা দেবীর বিচারকে মানতে হলে বিশ্বাসকে যুক্তির শাসনের মধ্যে না আনাই ভাল, তথাপি বক্তব্য যখন মাহাত্মকে নিয়ে তখন গুণবিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। কিক্ বলতে আমরা শুদ্ধ বাংলায় বুঝি পদাঘাত। সহজ কথায় মানে হয় লাথি। সত্য কথা বল্‌তে কি লাথির প্রত্যক্ষ রূপের সঙ্গে আমার দৈহিক পরিচয় না হলেও ফুটবল ম্যাচে লাথির নানা রূপ দেখেছি। খেলোয়াড়েরা ফুটবলকে ওড়ানোয় লাথি চালিয়েছে। উপযুক্ত লাথির গুণে বল গোলে ঢুকে গেছে। তার সঙ্গে রেফারীর বিচার নিয়ে দলাদলি শুরু হয়েছে, মারপিট চলেছে, যার যেমন খুশি তেমন করে। তার সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে সাদা সার্জেন্টের কিক্। আমি বলি, সার্জেন্টের কিক্‌কেই আসল কিক, কারণ ভীড় কমানোর প্রয়োজন থাকায় সার্জেন্ট কিক্ মেরেছে। নির্লিপ্তভাবে যাকে কিক মারা হল সে নিজেকে নির্দোষী জেনেও বিদেশী কিকের গুণে লাথি খাওয়া মানুষটি সার্জেন্টকেই সেলাম ঠুকে দিল।

একেই বলে ভক্তি রস! শক্তিপূজার বিশ্বাস আমাদের মধ্যে ভক্তি ঢুকিয়েছে, এই ভক্তির কৃপায় কিকের ঠোক্করেও যে বেদনা লাগে, তা মহানের দয়া বলে মনে হয়, সুতরাং কথাপ্রসঙ্গে কেউ যদি কিক-জড়িত বিশ্বাস ও ভক্তির কথা বলে থাকেন, তাহলে কিকের মাহাত্মকে স্বীকার করে নিতে হয়।

এইবার কিকের বিভিন্ন রূপ ও বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। আমি চাই, বলার দিকটা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হোক এবং মিস্টার প্রেসিডেন্ট এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করলে আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সুচিন্তিত বচসায় শেষ হতে পারে।

প্রেসিডেন্ট: বচসা? আলোচনাকে বচসার সঙ্গে এক করে দিলে আমাদের প্রগতিশীল চিন্তাধারার উপরেই যে কোপ পড়ে।

আমার ধারণা আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্যে থাকে বিভিন্ন মতামতের আদান প্রদান, যা থেকে পাওয়া যায় জ্ঞান, আপনি জ্ঞান সংগ্রহের বিশেষ উপকরণকেই বচসার ধাপে নামিয়ে দিলেন ?

প্রফেসর : নামা ওঠার বিচার তখনই সম্ভব হয় যখন আলো-চনায় সাংস্কারিক বিধানকে ব্যক্তিগত মত বলে প্রতিষ্ঠার প্রধান অবলম্বন বাকযুদ্ধ. যাকে চলতি চলতি ভাষায় বলা চলে তর্ক বা বচসা। সুতরাং স্বীকার করতে হয় আলোচনায় যা পাওয়া যায়, তাতে জ্ঞানের পুঁজি বাড়ে না সুতরাং এ বিষয়ে মহাশ্বেতা দেবী যদি সুর ও কথার লড়াই সম্বন্ধে একটা কিছু মিটমাট করে দিতে পারেন, তহেলে আমার মত থিওরী আঁকড়ে থাকা মানুষ কথা ও সুরের মাঝে কাকে প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে বুঝতে পারি।

মহাশ্বেতা : সুর ও কথার মাঝে যাঁরা লড়াই ঘটিয়েছেন তাঁদের পক্ষপাতিত্ব আসে বহুক্ষেত্রে একদিকের দুর্বলতাকে আড়াল দেওয়ার জন্য। যে মানুষ ধরা যাক কবি, কথার সংযোগে রূপ সৃষ্টি করেন সেই রূপ প্রকাশিত উচ্ছ্বাসকে মর্মস্পর্শী করতে পারে যেখানে প্রকাশভঙ্গীর জন্য কথা আপন সত্তায় স্বয়ংসিদ্ধ। ঠিক সেইভাবেই সুর আপন গুণে পূর্ণ রূপের অধিকারী. অর্থাৎ সুর বা ধ্বনির মাধ্যমে সব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা চলে। তবে আর্টের প্রকাশভঙ্গী যে দিক দিয়েই যাক, তা সীমার মধ্যে সীমাহীন, সুতরাং ছোটখাটো মতভেদ নিয়ে অসীমের দিকে ছোটা কেন ?

প্রেসিডেন্ট : এখন বুঝিয়ে দাও, অসীমের আমরা পাত্তা পাই কেমন করে ?

মহাশ্বেতা : আপনি ভাল রকমই জানেন যে অসীমের খবর পেতে হলে নিজেকে হারাতে হয়। এ কথা আপনিই আমাকে শিখিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট : অস্বীকার করি না। কিন্তু খোঁজার চেষ্টায় সন্ধানের বস্তুকে হারিয়ে নিজেকে ফিরে পেয়েছি।

প্রেসিডেন্টের কথা শেষ হওয়ার পর দেখা গেল, মহাশ্বেতার গৌরবর্ণ গণ্ডে লালিমার আভাস পড়েছে।

প্রফেসর: আপনাদের দুজনের কথাতেই যে সব বিষয়ে আভাস দিয়ে গেলেন, সেগুলি আমার বুদ্ধি দিয়ে কাজে লাগাবার চেষ্টা করলে নিশ্চয় জানি হতাশ হব। যাই হোক, সুর ও কথার বিষয় যখন উঠেছে, তখন আমি একটি প্রস্তাব করার অনুমতি চাই। প্রস্তাবটি গানের অনুরোধ। মিঃ পাকড়াশীকে আজ একটা গান শোনাতে হবে।

পাকড়াশী: আমি কালচারাল ব্যাপারে কোন অনুরোধই প্রত্যাখ্যান করি না, তবে গান সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে। আমি ধর্ম-কর্ম করে থাকি, কোন এক কারণে মাদুলী ধারণ করেছি, তাতে দিনক্ষণ না দেখে গান গাওয়া নিষেধ।

লিলি: ভাই ফিফি, এইবার অনুরোধটা তুমিই ডিস্টিঙ্গুয়িস্‌ড্ লোকটিকে কর। তোমার অনুরোধে মাদুলীর কোপ মিস্টার পাকড়াশীর উপর পড়বে না।

মি: প্রেসিডেন্টের উপর ভাগ্যের আক্রোশ থাকায় জমাটি বিলাতি রসের সঙ্গে দু-একদিন পাকড়াশীর কামড় খাওয়া সুরের আর্তনাদ শুনেছিলেন, সুরের ঘাড়ে কামড়ের শব্দ শুনেছিলেন; সেই শব্দ মনে আসতেই বুঝলেন একটি কেলেঙ্কারীর সম্ভাবনা ঘনিয়ে উঠেছে। তাই প্রেসিডেন্ট তাড়াতাড়ি বললেন, আপনারা আর যা-ই করুন, মাদুলী ধারণের শর্তকে বিদ্ধস্ত করলে আমরা সকলেই ধর্মের কোপে আক্রান্ত হয়ে পড়ব। সুতরাং—

প্রফেসর: সুতরাং কথাটি বেশ। দাঁড়ি, ড্যাস, হাইফেন, প্রশ্নের ইঙ্গিত, এক কথা দিয়েই সর্বত্র কাজ চালানো যায়। যাই হোক মাদুলীর কোপে যদি কিছু থাকে তো কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি সে কেবল আমার উপর পড়ুক, মিঃ পাকড়াশী আমাদের গান শুনিয়ে ধন্য করুন।

প্রেসিডেন্ট: মিঃ পাকড়াশী, মাদুলীর কোপ যখন ভাগাভাগি

হয়ে গিয়েছে, তখন আমরাও বলি, আপনি গলা ছেড়েই গান, যা থাকে আমাদের কপালে তা হোক। আনুষঙ্গিক কোন বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন আছে কিনা বলুন, মহাশ্বেতার বাড়িতে সে ব্যবস্থার অভাব হবে না।

গানের সঙ্গে প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করতেই মনে পড়ল সেদিনকার ঘটনা, যার জন্য বৃদ্ধ ভট্‌চাজ মশাই দায়ী। গানের মজলিসে তাঁকে প্রসিদ্ধ গায়কের পাশে স্থান দেওয়া হয়েছিল, কারণ তিনি নিজেকে একজন সমঝ্‌দার ভাবতেন। গান আরম্ভের পর সুরের ক্রমবিকাশের সঙ্গে ভট্‌চাজ মহাশয় বৈঠকীরীতি অনুসারে মাথা নাড়ছিলেন। এমন একটি গুণগ্রাহীকে হাতের নাগালে পাওয়ায় ভাবে বিভোর আত্মভোলা ওস্তাদ, তালের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করলেন টাকের উপর মোটা আংটি পরা চাটি মেরে। চাটি মারার পরই ওস্তাদ যখন বজ্রমুষ্টি মুখের সামনে ধরে আরও ভাল করে বোঝাতে চাইলেন দ্রুতমাত্রায় তালের গতি, তখন ভট্‌চাজ মহাশয় নিরাপদ স্থানের সন্ধানে ঘরের বাইরের দিকে চলতে লাগলেন।

এরপর সুরার সঙ্গে পাকড়াশী সুরের যোগ ঘটালেন। গুণগুণ করে গান ভাবের উচ্ছ্বাসকে ঠোক্কর মেরে উপরে তুলতেই সুর একেবারে চিৎকারের পর্দায় উঠে গেল, তার সঙ্গে বাঈজীর ঢঙে বিভিন্ন ইঙ্গিতপূর্ণ ভাঁও বাৎলানোর জন্য হাত নেড়ে নানা মুদ্রার প্রদর্শনী শুরু হল। প্রদর্শনীর প্রতিক্রিয়ায় আশেপাশের যাবতীয় পানাধার ছিটকিয়ে পড়ল মাটিতে। প্রাচীন ভিনিসিয়ান কাট্‌গ্লাস কাঁচের পাত্রগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। শব্দ শুনে পাশের ঘর থেকে খানসামা ছুটে এসে গ্যাখে মিঃ পাকড়াশী তেড়ে উঠে বাঈজীর ঢঙে হাত নাড়ছেন, তার সঙ্গে চলেছে গ্রীবার নৃত্য। প্রভুভক্ত ভৃত্য আর কিছু বাড়াবাড়ির ভয়ে ছুটে গিয়েছিল মিঃ পাকড়াশীকে ধরে ফেলার জন্য। মিঃ প্রেসিডেন্ট খানসামাকে বিরত করে বললেন, ভয় পাবার কিছু নেই, মিঃ পাকড়াশী গান গাইছেন।

এরপর পাকড়াশী সেদিনকার মতই বাঁ কানে হাত দিয়ে, ডান হাত এগিয়ে দিলেন সুরের উত্থান পতনকে প্রত্যক্ষ করাবার জন্য। হাত এগুলো, ইঙ্গিতপূর্ণ মুদ্রার প্রদর্শনীও শুরু হল, কিন্তু অস্পষ্ট গুণগুণ মৃদুধ্বনি এগিয়ে আসায় সুর রইল পিছিয়ে। এটা নাকি ওস্তাদি পাঁয়তাড়া। গানের গোড়াপত্তন চলতি রীতি অনুসারে হলেও, সুর বেরুবার আগে মিঃ পাকড়াশী বলে বসলেন, আমি কথা ছাড়া গাইতে পারি না, এবং এ আসরে আমাকে সেই কথাগুলিই ব্যবহার করতে হবে যে কথা একমাত্র একটি কবিই রসিকের সামনে এগিয়ে দিতে পারেন। সে কথার ভাবময় ব্যাঞ্জনা যে কোন রাগরাগিনীর সুরকে অধোস্তরে রেখে কথার ভাবে রসিককে মুগ্ধ করে দেয়।

এই ভীতিপ্রদ প্রস্তাব শুনে প্রেসিডেন্ট সত্যই এবার প্রমাদ শুনলেন। কালচারের আবহাওয়ায় মহামারীর সূচনা দেখে তবলচিকে বললেন, উনি যে রাগ বা রাগিনী কথার মধ্যে লাগাবেন, তা সাধারণ কিছু নয়, সুতরাং তালের ঠেকাকেও হিসাবী বোলের মধ্যে ফেলবেন না।

ইতিমধ্যে পাকড়াশী তুলনাহীন কথা ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছেন। বলাই বৃথা, বাঙলার কবিশ্রেষ্ঠ বলতে আমরা যাঁকে বুঝি, তাঁরই কথার ওলট পালট মি: পাকড়াশী শুরু করে দিলেন। এইভাবে যখন উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চালানো শুরু হয়েছে, সুর চলেছে আপন গতিতে, সেই সময় তবলচি ফাঁপরে পড়ে যাওয়ায় মিশিরজীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ওস্তাদজী সুরতো সমঝমে নেহী আরাহা হ্যায়, তাল সামালু ক্যায়সে? ওস্তাদ ধীর-গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন—জরুরৎ নেহি। তালকো জবাই কর দেও।

গানের ওস্তাদ এবং তবলচির এই কথায় ভাবোন্মত্ত পাকড়াশী হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন গানের মাঝখানে কনফারেন্সের দৃশ্য আমার কাছে অসহ্য। অতএব আজ আমার পক্ষে গান গাওয়া

অসম্ভব, কারণ গান কেবল কান দিয়ে শোনার জন্য নয়, মন দিয়ে বোঝার জন্য অনুভূতিরও প্রত্যাশা থাকে। সুতরাং ভাবের উপর যখন কোপ পড়েছে, তখন গায়ককে পেঁচিয়ে কাটা অপেক্ষা সোজা-সুজি বলাই ভাল, গান থামাও।

প্রেসিডেন্ট ভাবলেন, যাক্, আজ একটা ফাঁড়া কাটল। কালক্ষেপ না করে তিনিও পাকড়াশীর সমর্থনে উপস্থিত সকলকেই জানিয়ে দিলেন—এইরূপ দুর্ঘটনা যখন ঘটেছে, তখন মুড-ভ্রষ্ট শিল্পীকে গাইতে বলার আর অর্থ হয় না। সুতরাং তিনি যা গেয়েছেন তার জন্যই তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

লিলি প্রেসিডেন্টের কথায় সায় দিয়েই বললেন, আজ তাহলে ছবির কথাই হোক, কিন্তু যে শিল্পী বলবেন তিনি তো এখনও অনুপস্থিত।

প্রেসিডেন্ট: শিল্পী মানুষ, ভাবের ঘোরে কোথাও হয়তো ঘুরপাক খাচ্ছেন। সময়ের স্রোত চলে আপন গতিতে, কিন্তু শিল্পীর মনকে যা চালায় তার শক্তি আসে বাইরে থেকে। অতএব কোন জায়গা থেকে ধাক্কা খেয়ে আমাদের দিকে মুখ না ফেরালে, তাঁর অন্তর চালু হবে কিনা তা বোঝার উপায় নেই, ফলে কখন আসবেন, কিম্বা মোটের উপর আসবেন কিনা বলা যায় না। শুনেছি, ভদ্রলোক কেবল নব্যপন্থী নন, জাত-বোহিমিয়ান। কোন কোন সমালোচক তাঁর কাজকে সুররিয়ালিস্ট বলে অভিহিত করেন। কেউ বলেন কিউবিস্ট, কেউ বলেন ইমপ্রেসানিস্ট, আবার কেউ বলেন ফিউচারিস্ট। আরও কত ইজ্‌ম্‌-এর পৃষ্ঠপোষক সমালোচকরা ছাপার অক্ষরে নাম-করা দৈনিক কাগজে তাঁর সম্বর্দ্ধনা করে থাকেন তা বলা কঠিন। এইরূপ প্রচারে দোষের কিছু নেই, কারণ অনেক সম্পাদকই মনে করেন, কৃষ্টির পথ-প্রদর্শক হিসাবে যা হোক কিছু ছাপিয়ে কাগজের শূন্য স্থান ভরাট করতে পারলেই সম্পাদকীয় কর্তব্য শেষ হল।

শিল্পীর উপস্থিতি সম্বন্ধে যখন আলোচনা চলছিল, তখন খানসামা এসে জানাল, একজন কেমনতরো মানুষ এসেছেন। কেমনতরো বলতেই সকলে কুতূহলী হয়ে তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁকে ঘরের ভিতরে নিয়ে আসবার জন্য আদেশ দিলেন মহাশ্বেতা। প্রবেশ পথে শিল্পীর দর্শন লাভে বোঝা গেল, লোকটি কেমনতরোই বটে, পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট ওরিয়েন্টাল ধাপে উঠে গিয়াছে। পাছাপেড়ে পাৎলুনের শেষে গোড়ালীর কাছে দেখা যায় শাড়ির পাড়ের অনুকরণে নক্শার রেখায় ডেকরেটিভ প্যাটার্ন কিলবিল করে পোকার মত পাৎলুনের পাড়কে জড়িয়েছে।

ভদ্রলোককে শীর্ণকায় বলেই মনে হয়, কিন্তু টেলার্স আর্টের সাফল্যে বাহ্যরূপ ভ্রমাত্মক হয়ে আছে। গঠন বৈশিষ্টে এমন একটি কমনীয়তা আছে, যাকে একশ্রেণীর কলেজ পড়ুয়া মেয়েরা গাল-ভরা রসালো ভাষায় বলেন গাব্লু, সাহেবদের মতে বোধহয় ইরিসিস্টেব্ল্। ভদ্রলোকের মাথা থেকে শুষ্ক ঢেউখেলানো কেশরাশি নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। মুখের উপর ক্ষৌরকার্যের জন্য পরামানিকের কোন পাওনা নেই, কারণ গোঁফ-দাড়ি কখনও ওঠেনি, উঠবেও না। কাঁধের উপর থেকে ঝোলানো উৎকল দেশীয় সাধারণ পানের বটুয়ার অনুকরণে অতি বৃহৎ ম্যাস্কুলিন ভ্যানিটি কেস। ভ্যানিটি কেস ড্যামেজড্ কমপ্লেক্সান সারাবার জন্য হাইলি এফেকটিভ সরঞ্জামে ভরা। বুকপকেটে কয়েকটি তুলি মাথা খাড়া করে আছে।

শিল্পী ঘরে ঢুকতেই নতুনত্বের সাড়া পাওয়া গেল। প্রথম, তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গী, কোন নৃত্যবিদ্ যেন কত্থক নাচের ভঙ্গী দেখাচ্ছেন। মহাশ্বেতা শিল্পীকে অভ্যর্থনা জানালেন, তারপর পরিচয়ের পালা শেষ হল।

শিল্পী আসন গ্রহণ করার পূর্বেই বললেন, আমার আরও কয়েকটি অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে, তবু এখানে এসেছি, সেদিন আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রদর্শনীতে আমার ছবি বুঝতে না পারায় বলে-

ছিলাম, ছবি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একদিন ব্যবস্থা করুন, আমি গিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে আসব ছবি বলতে কি বোঝায়।

প্রফেসর : আপনার জন্যই আমরা সকলে অপেক্ষা করছিলাম, তবে কিছু বলার আগে যৎসামান্য কিছু রিফেশমেণ্ট মানে, সফ্‌ট্‌ ড্রিঙ্ক কিম্বা চ-টা…যাহোকে কিছু চলবে না?

শিল্পী : (আতঙ্কিত হয়ে) সফট্‌ ড্রিঙ্ক! গুড হেভেন্‌স্‌! বলেন কি? ও তো মানুষ মরার সময়ে পরলোকে আত্মশুদ্ধির জন্য গলায় ঢেলে দেয়। আমি মরছি না এবং মরবও না। শিল্পীর কাজই হল বেঁচে থাকা।

প্রফেসর : এত বড় সত্য কথা কমই শোনা যায়। এখন অনুরোধ করি আপনার বলা শুরু হোক—

শিল্পী : সাধারণত লোকে ছবি বললেই বোঝে চিত্রকর কোন গল্প ফেঁদে বসেছেন। ছবি আঁকার উদ্দেশ্য কিন্তু তা নয়। ছবি হল কেবল ছবি। ছবিতেই তার রূপের শুরু। রূপই ছবি আঁকার শেষ কথা। রূপ বলতে জানাতে চেয়েছি নকৃশা। এই নকৃশায় যে কোন রূপকেই সুন্দর করা যায়, কারণ সুন্দর কোন বিশেষ রূপের মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রাখে না।

প্রেসিডেণ্ট: যে রকম গভীর চিন্তাশীলতার কথা আপনি তুলেছেন, তাতে চিন্তাকে চালু করার আগে কিছু পাথেয় সঙ্গে রাখা ভাল। পাথেয় বলতে আমি শক্তির কথাই বলতে চেয়েছি, কারণ যে চলে তাকে চালায় শক্তি। বর্তমানে শক্তি সংগ্রহ সম্বন্ধে স্থূল দিকটার কথাই ভাবছি। আপনি যখন সফট্‌ ড্রিঙ্ককে প্রায় গঙ্গাজলের স্তরে তুলে মরার পাথেয় করেছেন, তখন জিজ্ঞাসা করছি কোন ব্র্যাণ্ড দিলে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন?

শিল্পী : লোকে বলে আমি নীলকণ্ঠ। তাই বলি, পাঁচ-মিশালী ককটেল দিলেও আমার আপত্তি নেই। তবে কোন কারণেই গঙ্গাজল নয়।

মহাশ্বেতা : ঠিক আছে, আমি চললাম ককটেল বানাতে। এতটা বলে মহাশ্বেতা উঠে গেলেন।

মহাশ্বেতা উঠে যাওয়ার পর মিঃ প্রেসিডেণ্ট বললেন, যিনি আপনার ককটেল বানাতে গেলেন, তাঁর সম্বন্ধে নাম-করা রস-গ্রাহীদের মত, ককটেল মিশ্রণে তাঁর হাতযশ এতই পাকা যে আত্মার উন্নতির জন্ম রসিকেরা স্বর্গদত্ত সুধাকেও ছেড়ে তাঁর তৈরি ককৃটেলই পান করে থাকেন।

প্রফেসর : উনি এই ককৃটেল মিশ্রনের প্রক্রিয়া কাউকে জানান না। অবশ্য মিশ্রণ জানলেই বা হবে কি ? তাতে ভাগের খবর না হয় পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ও হাতের ছোঁয়া না পেলে সুধার নাগাল তো পাওয়া যাবে না।

প্রেসিডেণ্ট : আপনি সেদিন মহাশ্বেতার গান না শুনে চেহারা দেখেই গানের তারিফ করে ফেললেন, তার উপর আজ হল ককৃটেলের গুণকীর্তন, এতে মনে হচ্ছে আপনার মন রঙীন হয়ে আছে, সুতরাং চড়া ককৃটেলে ভাগ বসালে রঙের রূপ আমরাও দেখতে পাব।

ফিফি : (প্রেসিডেণ্টের প্রতি) আপনি যখন একান্তই কড়া ককৃটেলের অনুরোধ জানাতে যাচ্ছেন, তখন বাধা দেব না। তবে ছবির কথাতে বলি, অনেকেই হয়তো জানেন না, আমার পিসতুতো ভগিনীপতির ভাই ছবি আঁকেন। একেবারে মানুষের ছবি হুবহু চেহারা মিলিয়ে দেন। সে কি অদ্ভুত মিল। মনে হয় এখনই সজীব হয়ে কথা বলবে। আঁকা ছবি আর ফটো দেখলে কে বলবে কোন্‌টা ক্যামেরায় তোলা, কোন্‌টা হাতে আঁকা ?

নকলনবিশীতে সাদৃশ্যের কথা উঠতেই শিল্পী হঠাৎ উত্তেজিত-ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, এ যে শিল্পীর আত্মহত্যার কথা। না না না। কিছুতেই না। অমন করে বাঁচাকে ফাঁকি দেওয়া আমি সমর্থন করি না। ছবিতে সাদৃশ্য একটি বীভৎস রূপ। কুৎসিত।

আমি বলতে চাইছি ছবির কথা, আর মহিলা তুললেন কুৎসিত আত্মহত্যার কাহিনী। মহিলার বর্ণনায় তাঁর আত্মীয়ের অাঁকা ছবি এত সজীব যে ঘরে সে-ছবি টাঙাতে পরামানিককেও স্থায়ীভাবে মাইনে দিয়ে রাখা দরকার, তা নাহলে ছবির মানুষের দাড়ি-গোঁফ, মাথার চুল, এমনভাবেই গজাতে থাকবে যে শেষপর্যন্ত বনমানুষের মত হলে বিচিত্র কিছু নেই।

ফিফি: আপনার মতে ছবি বোঝা কি সকলের কাছেই অনধিকার চর্চা?

শিল্পী: আপনি যেভাবে বুঝেছেন সে বোঝা ট্যাক্স ফ্রী হলেও অকল্যাণের সম্ভাবনা কম নেই। এই প্রসঙ্গে জানাতে চাই যে ছবির প্রধান গুণ সাদৃশ্যের মিল নয়, আরও কিছু।

ইতিমধ্যে খানসামা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল, তার সঙ্গে মহাশ্বেতা এবং প্রেসিডেন্ট উভয়েই ফিরলেন। মহাশ্বেতার হাতে ককটেলপূর্ণ পাত্র। পাত্রটি শিল্পীর হাতে দেওয়ার পর প্রেসিডেন্ট বললেন, গোড়ার কথা শুনতে পাইনি, ছবি সম্বন্ধে যখন আলোচনা শুরু হয়েছে তখন চলুক।

ফিফি: শিল্পী বলেছিলেন ছবির সঙ্গে দৃশ্যরূপের সাদৃশ্য বেশী খুঁজতে গেলে, মানুষের প্রতিকৃতিও বাঁদর হয়ে যেতে পারে।

প্রেসিডেন্ট: আপনার কি কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি আক্রোশ আছে? যিনি আজ আমাদের এখানে সম্মানিত অতিথি, তিনি প্রতিকৃতি আঁকেন মানুষের চারিত্রিক বর্ণনা শুনে। আসল চেহারার সঙ্গে ছবির মিল না থাকার দরুনই নতুন বোদ্ধারা দাম দিয়ে তাঁর ছবি কেনেন। এটা প্রগতিশীলতার সমর্থন। প্রশ্নের ফাঁক নেই।

প্রফেসর: দৃশ্যবস্তুর সঙ্গে যদি ছবির কোন সাদৃশ্য না থাকে তাহলে নকশাও তো উদ্দেশ্যহীন, কারণ ছবির নকশা আর কার্পেটের নকশা এক নয়। ছবিতে যে নকশা থাকে, তা শিল্পীর উচ্ছ্বাসের কথা বলে, যে উচ্ছ্বাসকে বুঝতে হলে এমন একটি রূপের আশ্রয় নিতে হয়, যে রূপ দর্শককে সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে পারে শিল্পীর

মনের কথা, যার অর্থ বুঝতে হলে ব্যাখ্যার চেয়ে দেখার উপরই নির্ভর করতে হয় বেশী।

শিল্পী: কি সর্বনাশ! আপনি এই বিরাট ব্যাপারকে সহজ করতে চাইছেন? সহজ হলেই তো সাধারণ হয়ে গেল। শিল্পীর মৌলিক চিন্তাধারা উর্ধ্বস্তরে উঠে গেলে তাকে যে কেউ ইচ্ছা করলেই বুঝবে, এমনটি আশা করাই অন্যায়। অতি সহজ ভাবে বোঝাই যদি আর্টের বিচারে চরম কাম্য হয়, তাহলে কাউকে ধরে এনে মনের সাধে মার দিলে দেখবেন, যে মার খায় তার বেদনার উচ্ছ্বাস কি ভাবে সহজবোধ্য হয়ে প্রকাশ হচ্ছে।

প্রফেসর: তার মানে যেখানেই ছবিতে বেদনার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে, সেখানে যা প্রকাশ্য, তা ভাল করে বুঝতে হলে শিল্পীকে ধরে দিলখুশ মার দিতে হবে? এই প্রথায় যদি ছবি বুঝতে হয়, তাহলে হয় শিল্পী ছবি আঁকা ছাড়বে, অথবা নির্দয়তার প্রচার দেখে দর্শকই বলে বসবে, কাজ নেই বাপু ছবি বুঝে, ছেড়ে দে তুই শিল্পীকে। যা নেই, তা পেয়েছি বলে স্বীকার করতে হলে নিজেকেই যে ঠকাতে হয়।

শিল্পী: যা দেখছি, তাতে এখানে আমার আসাই পণ্ডশ্রম হল। অবশ্য রুচির পরিবর্তন ঘটাতে না পারলেও লাভ সম্বন্ধে ফাঁকিতে পড়িনি। এ-রকম ককটেল এর আগে কোথাও খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। রূপে গুণে ভরপুর! মনে রঙ লাগছে বেশ!

প্রফেসর: আশা করি রঙ লাগার সঙ্গে ডুবসাঁতারের যোগ নেই।

ফিফি: (মহাশ্বেতার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন) ইচ্ছা ছিল, ডুবসাঁতারের স্ট্রোক্স দেখাব, কিন্তু এখুনিই আমাকে উঠতে হয়, কারণ চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আজকে খুব জরুরী মিটিং আছে। আমি আবার ওখানকার প্রেসিডেন্ট। উপস্থিত না থাকলেই নয়। জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হলে ঘরের কথাও ভুলতে হয়। দেখ না, ঘর থেকে বার হওয়ার সময়

ছোট মেয়েটা বললে, আমার জ্বর এসেছে মা, আয়ার কাছে একলা ফেলে যেও না। তবু আয়ার জিম্মাতেই মেয়েটাকে রেখে বেরুতে হল। এরপর আবার ফ্রেঞ্চ কনস্যুলেটে ককটেল্ আছে। বড় পার্টি নয়, সুতরাং আমি না গেলে অনুপস্থিতি কন্সপিকিউয়াস হয়ে উঠবে।

মহাশ্বেতা: তা কনস্যুলেটের ককটেলে যোগ দেওয়ার আগে একটু জমি তৈরি করে নিন না।

ফিফি: যথেষ্ট ধন্যবাদ। কিন্তু আমাকে যেতেই হচ্ছে। আচ্ছা, সকলকে নমস্কার। বলে ফিফি বেরিয়ে গেলেন।

প্রেসিডেণ্ট: যে কারণেই মিস ফিফি বিদায় নিন, আমাদের আসর মনে হচ্ছে আর জমে ওঠার সুযোগ পাবে না। তাছাড়া এখানকার আবহাওয়ায় যে-রকম ঝড়ের বেগে নানারকম মন্তব্য প্রকাশ হয়েছে, তাতে একটা কিছু কাণ্ড বেধে যাওয়ার আগে আজকের মত সভা ভঙ্গ হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করি। কিক মাহাত্মের বাকীটা শোনা হল না, প্রফেসরের ভাষণটি তোলা রইল, আর একদিন কাজে লাগানো যাবে।

শিল্পী: আজ একান্তই যখন সভা ভঙ্গ হচ্ছে, তখন আমিও বেরিয়ে পড়ি কোন একটা ঠাঁই খুঁজে নেওয়ার জন্যে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রেসিডেণ্ট তাঁর স্টাডিতে চেয়ারে বসে গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় কি একটা লিখছিলেন। এমন সময় ঘরের বাহিরে দরজায় টোকা এবং মহাশ্বেতার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রেসিডেণ্ট তাঁকে ভিতরে আসার আহ্বান জানালেন।

মহাশ্বেতা ঘরে ঢুকতেই অতি বৃহৎ প্রাচীন দেওয়াল ঘড়ির টাইম-এ সময়ের সঙ্কেত দিল। সময়ের নির্দেশ শুনে মহাশ্বেতা বললেন, যাক্, ঠিক আপনার খাবার সময়ে এসে পড়তে পেরেছি —এটাই আমার মস্ত বড় লাভ। অনেকদিন বাদে আপনার

ফেভারিট ডিশের কথা মনে পড়ল, তাই নিজেই রেঁধে নিয়ে এসেছি। পিসীমার জন্যও কিছু আলাদা আছে, ঠাকুর নিয়ে আসছে।

প্রেসিডেন্ট : সামনের চেয়ারে বস, একমিনিট। লেখাটা শেষ করে নিই, তা নাহলে অসুবিধায় পড়তে হবে।

অনুরোধ শুনে মহাশ্বেতা সামনের চেয়ারে নির্বাক অবস্থায় বসে রইলেন, এর কিছুক্ষণ বাদেই বাকী লেখাটা শেষ হওয়ায় প্রেসিডেন্ট বসলেন, আমি যে খ্যাতনামা পেটুক তা তো তুমি ভাল রকমই জানো, তবু অভিযোগ আছে আমাকে ভুলে থাকার জন্য। তোমার হাতের রান্নার প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব একটু বেশীই। যাক, বিলম্ব হলেও মনে পড়েছে এই যথেষ্ট।

মহাশ্বেতা : মনে পড়াটা সব সময়েই পিছু নিয়ে আছে, কিন্তু যাকে মনে পড়ে তার কাছ থেকে কোন সাড়া পাই না বলেই অছিলাকে কাজে লাগাতে হয়।

প্রেসিডেন্ট : অছিলাকে কাজে লাগানোয় আমার দিক দিয়ে ডবল লাভ। তোমাকেও কাছে পাওয়া গেল তার সঙ্গে মনোমত আহার।

মহাশ্বেতা : কাছে না পাওয়ার অসুবিধা তো আপনিই ঘটিয়েছেন। পুরনো কথাকে টেনে এনে কোন লাভ নেই, তবে জানতে ইচ্ছা করে কাছে এসে দূরে সরে গেলেন কেন ? জানি আমি সাধারণ, তাই বলে লিলির মধ্যে আপনি এমন কোন্ গুণপনা পেলেন ?

প্রেসিডেন্ট : (বাধা দিয়ে) তোমার গুণের আকর্ষণ অত্যন্ত বেশী, এমন কি অসাধারণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই অসাধারণের মোহে আটকে পড়লে কোন না কোন সময়ে নিজের সত্বাকেই ভুলতে হত, কারণ তোমার চাওয়াতে সংস্কারবদ্ধ শর্ত আছে ; যে শর্ত্তে সোজা প্রত্যাশা থাকে বিবাহ ; এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সমীহপূর্ণ আচরণের দাবী, অর্থাৎ বানিয়ে নেওয়া আত্ম-

সম্মানবোধ, কমপ্লেক্স ঘেঁষা সেল্‌ফ্‌ এষ্টিমেশান, যা প্রকারান্তরে সহজ আচরণকে জটিল করে তোলে। এই প্রত্যাশা সভ্যতার অভিশাপ কিনা তা আমার কাছে চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে, কারণ নরনারীর মিলন ক্ষেত্রে যখন উভয়ের দেহ ও মন এক হয়ে যেতে চায়, তখন শাসন জর্জরিত সমীহ, মিথ্যাচারকে কি ভাবে কঠোর করে তোলে তা সহজেই অনুমেয়। শর্তের কথা নিয়ে আরও বলি,—বিবাহের মধ্যে থাকে মালিকানার দাবী আর এই মালিকানার দম্ভকে আগলিয়ে থাকে এমন প্রত্যাশা, যেখানে যুক্তি একেবারে অসহায়। আর আদর্শের আবহাওয়ায় দেখি স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস কঠোর শাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আদিরসের প্রকাশে অত হিসাবের পাহারা রাখলে উচ্ছ্বাস-রস আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। তথাপি নরনারীর মিলনকে ভালবাসার প্রকাশ-ভঙ্গী এমন ভাবে জড়িয়ে থাকে, যে ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের দাবী সেখানে স্থান পায় না। আমার মতে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভালবাসার প্রত্যাশায় থাকে দৈহিক মিলনের বোঝাপড়া এবং উভয়ের দিক থেকে বাধাহীন আত্মসমর্পণ। রুচি ও রোমান্সের প্রয়োজনে নারীর সুশ্রী ও সৌষ্ঠবপূর্ণ গঠনকেই আকর্ষণের প্রধান সূত্র মনে করে থাকি। এই আকর্ষণকে মানার তাগিদ দেয় ইনষ্টিংক্ট যা অনেকের মতে লাম্পট্যের সামিল। অপরদিকে প্রকৃতিদত্ত কামনা সুস্থভাবে চরিতার্থ হলে আনন্দে দেহ ও মন পূর্ণ হয়ে ওঠে। সুস্থভাবে বাঁচার প্রয়োজনে নিরীহ আনন্দ যে একান্ত প্রয়োজন তাও স্বীকার করতে তোমাদের বাধে। তোমরা মিথ্যাকে ছদ্মবেশে সাজিয়ে সত্য বলে জাহির কর।

মহাশ্বেতা : যেভাবে আপনি কামশাস্ত্রের বিশদ বর্ণনা দিলেন, তার অর্থকরণের জন্য বাৎসায়নকে ডাকতে হয়। নারী কি কেবল রক্তমাংসে গড়া একটি প্রাণী, যার বোধশক্তি চালিত হয় কেবল অ্যানিমেল ইনষ্টিংক্ট দ্বারা ?

প্রেসিডেণ্ট : তোমার অনুমান আমার বিশ্বাসের খুবই গা

ঘেঁষে গিয়েছে। রোমান্সকে তখনই পুরোমাত্রায় পাওয়া যায়, যখন প্রকৃতিদত্ত উচ্ছাস স্বাভাবিক নিয়মে চলে। অবশ্যই প্রকৃতির নিয়ম বলতে আমি অ্যানিমেল ইনষ্টিংক্টকেই বিশেষভাবে কাছে রেখেছি।

মহাশ্বেতা: আপনি যে ইন্টেলেকচুয়াল হেঁয়ালীর সাধনায় একজন সিদ্ধপুরুষ তা আমি জানি। আমাদের মধ্যে মনকে নিয়ে লুকোচুরি খেলার পালা তো শেষ হয়েছে ; আর এই খেলার সুবিধা নিয়ে আর-একজন যে আমার পিছু নিয়েছেন, সে খবর কি রাখেন ? শুধু পিছুই নেননি, তুতির প্রয়োগে আমাকে বাগদত্তা করিয়েও ছেড়েছেন. বিবাহের দিনও যাতে শুভস্য শীঘ্রং হয়, দুই পক্ষের পুরোহিতরা সেই চেষ্টায় আছেন।

প্রেসিডেন্ট: বিবাহের খবর না জানলেও তোমার প্রতি প্রফেসর সাহেবের দৃষ্টির অর্থ বোঝায় অসুবিধা কিছু হয়নি, কারণ সে-খবর জেলাসির ইনষ্টিংক্ট আমার কানের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। তবে যিনি আড়াল থেকে কিউপিডের বাণ নিক্ষেপ করেছেন তাঁর শরসন্ধান শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যভেদের উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে পারবে না সন্দেহ আছে।

মহাশ্বেতা: আপনি একটি অদ্ভুত কনট্রাডিকশান। একবার আমাকে নিয়ে জেলাসির টানাপোড়েনে পড়ছেন, তার সঙ্গে অপর কেই যদি পাওনার অধিক পেয়ে যায় তাতেও আপনার আপত্তি কম নয় ; মাঝখানে রয়েছেন উদার দৃষ্টিভঙ্গী—চমৎকার। এর থেকে প্রমাণ হয় আপনি নিজেকে যতটা উদার মনে করেন ততটা নন। এইখানে বলি. যদি আমার রূপের আকর্ষণ ও ভিন্ন মতকে জড়িয়ে গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে বুঝব, আপনি সত্যই উদার। এটা তো নিশ্চয়ই জানেন যে কোন রূপই গুণবর্জিত নয়। রূপ থাকলেই যদি তার গুণকে মানতে হয় তাহলে আমার বেলা ভিন্ন বিচার হবে কেন ?

প্রেসিডেন্ট: আমরা দুজনেই সত্যকে এমনভাবে আড়াল দিচ্ছি

যা আত্মপ্রবঞ্চনায় সহায় হতে পারে। লিলির কথায় ফিরে আসি। মহিলার প্রতি তোমার আক্রোশ দেখে মজা লাগছে। জিজ্ঞাসা করি, তুমি ঐ প্রফেসরের মত সচল বুক-সেলফের প্রতি আকৃষ্ট হলে কেমন করে? আসলে লোকটা গ্রন্থাগারের পুষ্টপোষাকীট, ওর একমাত্র কাজ পড়ে পাওয়া খাদ্য খেয়ে যাওয়া। কথাবার্তায় দেখা গিয়েছে কেবল কোটেশানের উদ্‌গীরণ, নিজের চিন্তা সেখানে নেই, পরের উচ্ছিষ্ট খাদ্যই ওর বাঁচার অবলম্বন। তার উপর লোকটা বধির এবং দৃষ্টিহীন, সোজা কথায় কালা ও কানা। সুরের ধ্বনি ওর কানে পৌঁছায় না, এবং ছবি, মূর্তি, অথবা যে-কোন সুন্দরের রূপ কোনদিন ওর অন্তরে প্রশ্ন তোলেনি। অথচ সঙ্গীত তোমার কাছে বাঁচার একটি প্রধান অবলম্বন। আমি ভাবতেও পারি না সুরকে বিদায় দিয়ে ঐ লোকটার সঙ্গে তুমি সারাটা জীবন কেমন করে কাটাবে?

মহাশ্বেতা: কথা দিয়ে ফেলেছি, এখন আর বদলানো যায় না।

প্রেসিডেন্ট: বদলানো যায় কিনা এমন কথা আমি জিজ্ঞাসা করিনি, এবং তোমার মত বদলালেও আমার যে বদলাবে না তা আমি জানি। তোমার কথা ভেবেই জিজ্ঞাসা করছি, তোমার কথা দেওযার পিছনে এমন তাগিদ থাকতে পারে, যার সঙ্গে অনুরোধের চাপে কৃপান্বিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কৃপাকে মধ্যস্থ করে বিবাহের বন্ধনকে পাকা করতে গিয়ে যাকে তুমি জীবনের সাথী করতে চলেছ, তাকে তুষ্ট করতে শেষ পর্যন্ত তোমার কৃপা তোমাকে দেউলিয়া না করে ছাড়ে।

মহাশ্বেতা: প্রেসিডেন্ট সাহেব, অনেকদিন বাদে তোমাকে তুমি বলে সম্বোধন করছি, চমকে উঠ না। তোমার ভুল ধারনা ভেঙে দিতে চাই। প্রথমেই বলি, লিলির প্রতি আমার কোন আক্রোশ নেই। আমি জানি, তুমি প্রেমের ব্যাপারে একজন উঁচুদরের খেলোয়াড়। তোমার খেলা শেষ হলেও বাতিলের মধ্যেই পড়বে, কারণ ও যতই ফরোয়ার্ড হোক, আসলে তুমি মোস্ট ব্যাকওয়ার্ড

এবং প্রাচীনপন্থী। তুমি চাও বনিয়াদী ঘরোয়া মেয়ে। কিন্তু এটা জেনো তুমি উপস্থিত যাকে চাও সে নত হলেই তোমার চাওয়ার জীবটি দম দেওয়া কলেরমত চলবে এবং সবসময়েই ঐযন্ত্রচালিতকে চালানোর জন্য তোমাকে অতিষ্ঠ হয়ে থাকতে হবে। আর প্রফেসর সম্বন্ধেও তোমার ধারনা ভুল। সচল বুক-সেলফ্ অথবা তুমি যাকে গ্রন্থকীট বল, সঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি একজন উঁচুদরের বিশেষজ্ঞ। ভদ্রলোক শুধু রাগ রাগিনীর বৈশিষ্টই বোঝেন না, উনি নিজে ভাল গাইতেও পারেন।

প্রেসিডেন্ট : কীট সম্বন্ধে এত খবর সংগ্রহ হল কেমন করে ?

মহাশ্বেতা : স্বকর্ণে গান শুনে।

প্রেসিডেন্ট : তোমার ওখানে ভদ্রলোক তাহলে গতায়াত বেশ জমিয়েই তুলেছেন দেখছি। কবে থেকে দুর্লভকে সহজলব্ধ করে ফেললে ?

মহাশ্বেতা : অনধিকার চর্চায় একান্তই যখন নামবে তখন বলি, যেদিন লিলির বাড়িতে গান গেয়েছিলাম তার পরদিনই আমার গান শুনে ভদ্রলোক টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট : তারপর আসা যাওয়াটা ঘন ঘন করে ফেলেছিলেন ?

মহাশ্বেতা : প্রশ্ন অবান্তর। দুর্লভকে নাগালে পেলে···

প্রেসিডেন্ট : যা ঘটা উচিত ছিল তাই ঘটেছে ? প্রফেসর যে তোমার ওখানে আসর জমিয়ে তুলেছেন, সে খবর আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিলে কেন ?

মহাশ্বেতা : জানার অধিকার তুমি নিজেই ছেড়ে দিয়েছিলে বলে।

প্রেসিডেন্ট : এক কথায় এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ওলট্ পালট্ হয়ে গেল ?

মহাশ্বেতা : এক কথায় হয়নি : দিনের পর দিন তোমাকে আমার মত করে চেয়েও যখন পেলাম না, তখন বুঝলাম তোমার প্রকৃতি বিবাহকে সায় দিতে পারছে না।

প্রেসিডেন্ট : তখনের পর আর কিছু যা আছে তা জানতে চাইছি না, শুধু এইটুকু বলি, আমার ধারনা জন্মিয়েছিল তুমি পুরুষ ও নারীর ভালবাসাকে আধ্যাত্মিক কেন্দ্রে তুলে ফেলেছিলে, আর এই ভালবাসার আদর্শকে মানতে গিয়ে তুমি নিজেকে হয়তো দেবীর স্তরে তুলতে চেয়েছিলে যার প্রতিক্রিয়ায় দৈহিক মিলনকে জঘন্য প্রবৃত্তি ভাবতেও তোমার বাধেনি। তোমার প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে মিল নেই, তা তুমি ভাল রকমই জানতে; তথাপি ছোঁয়ার নাগাল এড়িয়ে আমার কাছে আসার জন্য তোমাকে ব্যাকুল হতে দেখেছি। তবে কি আমার বোঝায় ভুল হয়েছিল ?

মহাশ্বেতা : বোঝায় ভুল হয়নি, বিচারে গলদ হয়েছিল। দৈহিক মিলনের ইচ্ছা যে আমার মধ্যে ছিল না এমন কথা তুমি ভাবতে পারলে কেমন করে ? তবে এটা ঠিক, আমি সামাজিক ও সাংস্কারিক রীতি মানি, তাই আমাদের মিলনকে বিবাহের আশ্রয় দিতে চেয়েছিলাম ; কিন্তু তুমি আমার ব্যবহারে সামান্য অসমর্থন বুঝতে পেরেই, আমার কাছ থেকে সরে গেলে কেন ? কেন তুমি জানতে চাইলে না যে, পরমবাঞ্ছিতকে যে-বাধা দিয়েছিল, সে আমি নই, আমার সংস্কারবদ্ধ লজ্জা ?

প্রেসিডেন্ট : আমার বেলায় তোমার বাধা এল লজ্জার অস্ত্র খাড়া করে, আর ঐ কাটটা তোমার অস্ত্রকে দিল ভোঁতা করে ?

মহাশ্বেতা : ছিঃ ! অমন করে ভদ্রলোককে যা তা বলো না।

প্রেসিডেন্ট : তাহলে ঐ মেরুদণ্ডহীন জীবটিকে কীট বলায় তোমার আঁতে ঘা লাগছে, তার মানে কীটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে !

মহাশ্বেতা : জেলাসিকে সায় দিতে গিয়ে তুমি যে ভালগার হতে পারো তা আমার জানা ছিল না। যেদিন অসুরের শক্তি নিয়ে তুমি আমাকে গুঁড়ো করে ফেলতে চেয়েছিলে, আমি ঠিক সেইভাবেই তোমার কাছে ধরা দিতাম, এবং ধরা না দিলেও তোমার যে শক্তি আছে তাই দিয়ে আমাকে জোর করে নিলে

না কেন? পাঁজরা ভাঙার শক্তি দিয়ে যখন তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলে তখন বিশ্বাস কর, আমিও চেয়েছিলাম তোমার বজ্র বাঁধনে আমার শরীর পিষে যাক। কিন্তু তোমার উত্তেজনায় এমন একটি দুর্দ্ধর্ষ পাশবিক রূপ দেখেছিলাম, যাতে মনে হয়েছিল, তুমি মানুষ নও, তুমি কামোন্মত্ত পশু। তাই ভয়ে তোমার কাছে থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে দূরে সরে গেলাম, আর আমার এই ব্যবহারে তুমিও মুহূর্তে ভিন্ন মানুষ হয়ে গেলে। ভাবতে লাগলাম, পুরুষ ও নারীর ভালবাসায় দৈহিক মিলনই কি শেষ কথা?

প্রেসিডেন্ট: প্রথমেই বলি, বলপ্রয়োগে তোমাকে পেলে আমার বাসনা পূর্ণ হত না, কারণ আমি যা চাই তা জোর করে পাওয়া যায় না, এমন কি সম্রাটের ঐশ্বর্যের বিনিময়েও কেনা চলে না। আমি যা চাই তা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে আপনা থেকেই আসে। প্রার্থীকে সবকিছু দিয়ে ফেলাটাই দাতার কাছে চরম কাম্য হয়ে ওঠে। আমি চলতি মতে চরিত্রহীন হতে পারি, কিন্তু ভোগের তাগিদে আমি কখনও কোন অনিচ্ছুক নারীর উপর শক্তির ব্যবহার করিনি। অর্থ বা বাকপটুতার বিনিময়ে যাদের পেয়েছি তাদের নিয়ে খেলা করেছি, যেভাবে ছোট ছেলেমেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলা করে। আমি পুতুলদের নিজের ইচ্ছার অধীনে এনেও বুঝলাম যা পেয়েছি, তা চাইনি। এই সময় গান শেখার জন্য তুমি এলে আমাদের বাড়িতে, কারণ মিশিরজীকে যে শর্তে বহাল করা হয়েছিল তাতে তার অন্যত্র গান গাওয়া কিম্বা শেখাবার অনুমতি ছিল না। তুমি এলে মাদকীয় গঠনশ্রী সঙ্গে নিয়ে। পরিচ্ছদের আড়াল সত্ত্বেও তোমার সৌষ্ঠবপূর্ণ দেহশ্রীর আকর্ষণ আমাকে এমনভাবেই মোহমুগ্ধ করে ফেলতে লাগল, যাতে বেশীদিন চিত্তচাঞ্চল্যকে সংযমের মধ্যে রাখা গেল না। দূর থেকে নানাপ্রকারে জানাতে হয়েছিল তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে, তুমি তা বুঝেওছিলে এবং আমার বুভুক্ষু মনকে শান্ত করার সমর্থনও

পেয়েছিলাম তোমার কাছ থেকে। তাই আমি তোমাকে পেতে চেয়েছিলাম দেহ ও মনকে এক করে দিয়ে। আরও পরিষ্কার করে বলি, আমার চাওয়ার মধ্যে ছিল, তোমার দেহের নিবিড় স্পর্শে আমার সুস্থ এবং স্বাভাবিক কামনার বিনিময়ে তোমার স্বতঃপ্রবৃত্ত কামনা, নিশ্চয়ই তোমার দেহ দান নয়।

ঠিক আমার মতন করে দেহ ও মনকে একসঙ্গে পেতে তোমার মনও হয়তো সাড়া দিয়েছিল আড়াল থেকে, কিন্তু তুমি হলে প্রকাশ্যেই বিমুখ। তাই তোমাকে গাঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে পেয়েও বুঝেছিলাম, চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার গরমিল ঘটেছে, সুতরাং তোমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ তুমি তখন এমন ভাবেই বাধা দিয়েছিলে যাতে মনে হয়েছিল আমি যেন একটি ঘৃণ্য জীব। তুমি যদি আমি যা চাই সেইভাবে ধরা দিতে, তাহলে আমি নিজেই সমাজের ক্রূর দৃষ্টি থেকে তোমাকে বাঁচাতাম। শুধু বাঁচাতাম না, আমার নিজের স্বার্থেই তোমাকে উর্ধ্বে তুলে ধরতাম, এতো বিবাহের চেয়েও বড় বন্ধন আমাদের জড়িয়ে থাকত। যেখানে আইনের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু তুমি আমার ভালবাসার স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গীকে এমনভাবেই বিচার করলে যাতে মনে হল, তুমি আমার প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছ। পুরুষ ও নারীর মিলনে সবদিক দিয়ে একে অপরের সাহায্য না পেলে উভয়ের একত্রে বাঁচাই বিড়ম্বনা হয়ে ওঠে। আন্তরিক সহায় তখনই এগিয়ে আসতে পারে যখন উভয়েই উভয়কে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারে। আমি এদিক থেকে নিজেকে বলব হতভাগা।

এই সময় ঘড়ির টাইম বেজে ওঠায় জানিয়ে দিল আধঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে প্রেসিডেন্ট চেয়ার থেকে উঠে বললেন, যাক, এখন ওসব কথা থাক, ভিতর বাড়িতে চল, ক্ষিদে সুস্থ শরীরকে বাঁচার জন্য তাগিদ দিচ্ছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মিঃ পাকড়াশীর মানসিক অবস্থা শোচনীয়। ভালবাসা সংক্রান্ত নানা ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছে যে বিশুদ্ধ প্রেমের দরবারে পৌঁছাতে হলে অনেক বিপদসঙ্কুল কেন্দ্র পার না হয়ে উপায় নেই।

যদিও ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে নখীর সঙ্গেই একটা পাকাপাকি ব্যবস্থার জন্য মিঃ পাকড়াশী উঠে পড়ে লেগেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিফি নখের পরিবর্তে পদাঘাতের আশ্রয় নেওয়ায় পাত্রী বদলের প্রয়োজন এসে পড়ল। পালিশ করা রঙীন ধারালো নখের গভীর আঁচড়ে যে রকমেরই প্রেম-নিবেদনের ইঙ্গিত থাকুক, তার বেদনা ভবিষ্যতের আশাকে জখম করে ফেলেছিল, তার উপর বল্লমের মত পিতলের ছুঁচালো হাই-হিল জুতার নিভুল লক্ষ্যসন্ধানী পদাঘাতের সংস্পর্শে আসার পর তিনি বুঝলেন, পুনরায় এই জাতীয় ঘটনা ঘটলে অঙ্গহানির সম্ভাবনা সুনিশ্চিত। সাধে কি প্রগতিশীল প্রেমিকের দল স্লিমমার্কাদের পিছনে ছোটে?

মিঃ পাকড়াশী জানতেন যে কৃষ্টিসাধনে তিনি নিজেকে যেভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন তাতে প্রগতির দিকে দৃষ্টি রাখতে গেলে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আর কাউকে দেওয়া চলে না। কোন প্রকারে অন্তরে জমাট বাঁধা উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করতে না পারলে তাঁর ক্রিয়েটিভ এনার্জি নিস্তেজ হয়ে যেতে পারে।

আকারযুক্ত প্রেমের আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হওয়ায় মিঃ পাকড়াশী শূন্যে ঝোলা প্রেমের দিকেই নজর ফেরালেন, অর্থাৎ সেই পরিচিত দোতলার বারান্দায় ঝোলায়মান বিচিত্র নক্শায় ছাপমারা শাড়ির মালিকের প্রতি।

দোলায়মান শাড়ির মালিককে দেখার জন্য সুবিধা পেলেই মিঃ পাকড়াশী নির্দিষ্ট স্থানে একবার হানা দিয়ে যেতেন। অদৃষ্টে

সাফল্য লেখা থাকলে তাকে রোখে কে? সেদিন দৈবকৃপায় সুফল পাওয়া গেল। মিঃ পাকড়াশী পথে চলতে দেখলেন, সেই শাড়ি তার মালিককে জড়িয়ে চোখের সামনে দিয়েই চলেছে। নখের আঁচড়, এমন কি অতি আধুনিক চালে হৃদয়হীনার কঠিন পদাঘাত, রিক্শায় কল্পিত নারী নির্যাতনের জন্য অন্ধকার গলিতে বেধড়ক ঠ্যাঙানি, সবই স্মৃতির চলচ্চিত্রে চোখের সামনে সাবধানতার বার্তা নিয়ে ঘোরাফেরা করলেও মিঃ পাকড়াশীর অদমনীয় আশাকে শাড়ির মালিক টেনে নিয়ে চলল তার পিছনে পিছনে।

শাড়ির মালিকের কাছে এইভাবে পিছু নেওয়া নতুন নয়। নতুন নয় কেন বলি, অগ্রগামীর চলা, পিছন দিকে মুখ ফেরানো এবং তৎসহ ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি থেকে বেশ বোঝা যায় যে সময় বুঝে রাস্তায় হাঁটা স্ত্রীলোকটির একটি ব্যবসার উপকরণ। এই জাতীয় স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিঃ পাকড়াশী কখনও মেলামেশা করেনি। তথাপি মিঃ পাকড়াশী দৈব কৃপা মানতেন, তাই ভাবলেন এবার তাঁর কপাল ভাল, কারণ একবার নয়, দুবার নয়, বারবার স্ত্রীলোকটি ফিরে শুধু তাকায়নি, অর্থপূর্ণ মুচকি হাসিও দিয়েছে।

স্ত্রীলোকটি ভীড় ছেড়ে একটি গলির মধ্যে ঢুকল। সময় তখন বিকেল পার হয়ে সন্ধ্যার দিকে ঝুঁকেছে। জায়গাটা কেমন রহস্যপূর্ণ। যারা চলাফেরা করছে তাদের মধ্যে অনেকেরই চলার মাঝে টলা দেখলে বেশ বোঝা যায় যে ভিতরে তেজীয়ান কিছু গোল বাধিয়েছে। রাস্তার ধারে রোয়াক পেলেই দেখা যাচ্ছে, আগের স্ত্রীলোকটির মতই এখানে ওখানে সেখানে মেয়েরা নানা ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ বসে আছে, কেউ বা কথাপ্রসঙ্গে হাসির রায়ট লাগিয়ে দিয়েছে। এ হাসি কেবল আত্মবিজ্ঞপ্তির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। মিঃ পাকড়াশীর মনে হল, ভালবাসার ব্যাপারেও ভেজাল চলে বেশ। তিনি মনে মনেই বললেন, এ তো খাঁটি নয়। এঁ্যা। মেয়েটা শেষ পর্যন্ত ঠকাল? ঘটনাটির উপর ধিক্কার দেওয়ার জন্য মন প্রস্তুত হতেই তিনি উল্টোদিকে চলতে

আরম্ভ করলেন। চলাকে দ্রুত করতে যাবেন, ঠিক এমনি সময়ে চলন্ত শাড়ির মালিক একেবারে তাঁর কাছে এসে বললে, আ মর মিন্‌সে। এতটা পথ এগিয়ে এসে তারপর কিনা পিছন ফেরা! ওসব চালাকি এ পাড়ায় চলবে না।

মিঃ পাকড়াশীকে যেখানে দাঁড়িয়ে কথাগুলি শুনতে হল সে জায়গাটি একটি রোয়াকের সামনে, এবং সেখানে তিন-চারজন পূর্ববর্ণিত নারী একত্রিত হয়েছিল। মিঃ পাকড়াশীর উপর 'আ মর মিনসে' কথাটি প্রয়োগ হওয়াতে সকলেই দলবদ্ধ হয়ে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হল এবং বিনা প্রশ্নে একজন তাঁর গলার কাছে জামা ধরে টান মারতেই সরু ফিতা লাগানো রিমলেস মনোকল্ চোখের বাঁধন থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এল।

মিঃ পাকড়াশী বলে উঠলেন, কর কি? কর কি? চোখ গেল।

একজন বলে উঠল, অমন চোখ, গেল বললেই যায় নাকি? কেন বাবু দাম কমানোর চেষ্টা করছ? আমাদের এখানে এক-কথায় সব কাজ চলে। যেদিকে দৃষ্টি চালিয়ে এতটা পথ ওকে ঘোরালে তার দামটা দিয়ে যাও।

মিঃ পাকড়াশীর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, তিনি বিপদে পড়লে পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত ছুটতে পারতেন, এর প্রমাণ কিছুদিন আগেই সাধু সাজার চেষ্টায় পাওয়া গিয়েছে। মিঃ পাকড়াশী যখন বুঝলেন বিপদ ঘাড়ে চেপেছে, তখন তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও অভ্যাস অনুসারে কাজে লাগালেন।

বিপদের কেন্দ্র থেকে অনেকটা দূর আসার পর মিঃ পাকড়াশী যখন হাঁফ ছাড়ার অবকাশ পেলেন, তখন তিনি বিচার করে দেখলেন, প্রেম করা বোধহয় তাঁর কুষ্ঠিতে লেখা নেই। অথচ কৃষ্টি সাধনের জন্য নিজের মত করে বাঁচতে হলে প্রেম একান্তই আবশ্যক, কিন্তু তা পাওয়ায় যত সব বিঘ্ন এসে জুটছে।

এবার কৃষ্টি সাধনের চেষ্টায় কবিতা নয়, ছবি নয়, গান নয়,

চেষ্টা জলজ্যান্ত ফুলকে জড়িয়ে। ফুল সাজানো যে একটি উচ্চাঙ্গের আর্ট তা দেশী ফুল ব্যবসায়ীরা না জানলেও, ফুলকে স্বদেশী তোড়ার বাঁধনে দমবন্ধ হয়ে মরা থেকে বাঁচানোর জন্য মিঃ পাকড়াশী বেশ জাঁকজমক করেই ফুলকে জড়িয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন শুরু করে দিলেন। ফুল সাজানোর প্রথায় মিঃ পাকড়াশী দেখেছেন পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই যা নিশ্চিন্ত মনে সাজানোর উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা না চলে। যেমন ভাঙা গরুর গাড়ির চাকার টুকরো থেকে আরম্ভ করে রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া যে কোন পরিত্যক্ত কলকব্জার টুক্‌রো, মুড়ো ঝাঁটা, শুক্‌নো ডাল মুড়ি, ইঁট পাটকেল, পাথুরে কয়লা, কাঠ কয়লা, ঘুনধরা পুরানো গাছের গুঁড়ি, তার সঙ্গে লোকশিল্পের দৃষ্টান্ত, পোড়া মাটিতে তৈরি দেবদেবীর ভগ্নাংশ তো আছেই। উক্ত সবকয়টি উপকরণই ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এমন ভাবেই ব্যবহার করা হয়, যাতে ফুল, নিজস্ব রূপ টপকিয়ে আছাড় খেয়ে পড়তে পারে কোন ভাবময় অভিব্যাক্তির উপর। খবরের কাগজে এই জাতীয় আছাড়ের বিবরণ অনেকেই পড়েছেন এবং কৌতূহল চরিতার্থের তাগিদে ফুল সাজানোর কৃতিত্ব দেখেওছেন।

কিন্তু মিঃ পাকড়াশীর এমন আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই যা দিয়ে তিনি একক প্রদর্শনী খুলে ফুলের সাহায্যে তাদের সাজানোর প্রথায় আর্টকে পাকড়াও করতে পারেন। মিঃ পাকড়াশী মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন, তাঁর মন হল যেন দৈব অভিশাপ তাঁর পিছু নিয়েছে। ন্যায্য কৃপা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তিনি অদৃশ্যলোকবাসী উপরওয়ালাকেই অভিশাপ দিয়ে বসলেন। গত্যন্তরে তিনি রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুগুলির সংগ্রহ করা শুরু করলেন।

যে পৃষ্ঠপোষকের উদ্যোগে পুষ্পপ্রদর্শনীতে শোরগোল পড়ে গেল তিনি আড়াল থেকে খরচের ভার নিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে ছবি বা মূর্তি বেচে চিত্রশিল্পী বা ভাস্কর কমিশন দিয়ে যেটুকু লাভের অংশ ভাগাভাগি করে নিতে পারেন তা ফুল সাজানোর

কৌশল দেখিয়ে সম্ভব নয়, কারণ ফুল বাসি হলেই তা বাতিলের মধ্যে পড়ে, তাছাড়া ভাঙা শুখনো ডাল, কুটো, পাথরের নুড়ি বা মুড়ো ঝাঁটা, যেভাবেই সাজানো হোক তা আবর্জনার পংক্তি থেকে উদ্ধার করার উপায় নেই, কারণ রসসৃষ্টির প্রমাণ হিসাবে কোন রসিকই রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া মুড়ো ঝাঁটাকে পরম আদরে দেওয়াল বা ড্রইং রুমের শোকেশে সাজিয়ে রাখেন না। মিঃ পাকড়াশী এখানে কেবল খাটুনিকেই কাজে লাগিয়েছিলেন, খরচের দিকটা বহন করেছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক। তবে প্রদর্শনী কক্ষে দর্শকরা মাঝে মাঝে এমন সব টিটকারী দিচ্ছিলেন যাতে যশের সঙ্গের দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও বেশ বেড়ে উঠছিল। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলি :

প্রথম দিনের প্রদর্শনীতে যেসব ফুল সংগ্রহ হয়েছিল সেগুলি পরের দিন শুকিয়ে মুচড়িয়ে প্রায় আমচুরের মতন হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে দেখা গেল প্রদর্শনী কক্ষে লোকজনের একান্তই অভাব। লোকে বলে, কলকাতায় যে কোন কলাচর্চার প্রদর্শনীতে প্রধান আকর্ষণ নানা প্রথায় ঘের দেওয়া সাড়ির ভীড়। শুকনো ডাল দেখিয়ে দর্শক ডেকে আনার কোন সম্ভাবনা না থাকায় পাকড়াশীর পৃষ্ঠপোষক নিঃসন্দেহ হলেন যে লোকটা তাকে ঠকিয়েছে।

যৌবন-ঠাসা নারী দর্শনলোভী পৃষ্ঠপোষক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পাকড়াশীকে পাকড়াও করে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন তারপর নিজস্ব প্রথায় আপ্যায়ন শুরু হল। পৃষ্ঠপোষক পাকড়াশীকে যুৎসই ভাবে চেয়ারে বসিয়ে নিজে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন এবং দুই কাঁধে হাতীর পায়ের মত মোটা মোটা হাত চালিয়ে কিছু বলার আগেই দিলেন এক ঝাঁকুনি। তারপর সুমিষ্ট ভাষণ দ্বারা বলতে লাগলেন, তুমি একটা ছুঁচো। আমার টাকা কি রাস্তার খোলামকুচি? শাড়ি যারা পরে তাদের বাছাই করে দেখার জন্যই তো আমি তোমার ইঁট-পাটকেলের একজিবিশনে এত খরচ

করেছিলাম। এখন যে ফাঁকিতে পড়লাম সে লোকসানটা পুষিয়ে দেবে কে? ছোটলোক কি আর গাছে ফলে? কথায় দাঁড়ি পড়ল আর একটি মোটা ঝাঁকুনি দিয়ে। মিঃ পাকড়াশী বোঝাতে চাইলেন যে পাতার সবুজ ও ফুলের রং যতই তেজীয়ান হোক না কেন, বাসি হলে তেজ ঝিমিয়ে যায়। কিন্তু পৃষ্ঠপোষক যা বুঝলেন তাতে তাঁর তেজ আরও বেড়ে উঠল এবং আর একটি ঝাঁকুনি দেওয়ায় মিঃ পাকড়াশীর মনে হল তিনি যেন হাতীর পায়ের তলায় চাপা পড়েছেন। যাই হোক, কোনপ্রকারে পৃষ্ঠপোষকের কবল থেকে অবশেষে মিঃ পাকড়াশী মুক্তি পেলেন।

কান টানলে মাথা আসে কথাটার পিছনে যে অর্থই থাক, মোটা হাতের ঝাঁকুনিতে মিঃ পাকড়াশীর মাথায় বুদ্ধি খুলে গেল, তিনি বুঝলেন তাঁর অতুলনীয় প্রতিভাকে জনসাধারণের কাছে উপযুক্তভাবে পরিচিত করাতে হলে বর্তমান পৃষ্ঠপোষককে বাতিল করতে হয়।

বুদ্ধির তাগিদ মিঃ পাকরাশীকে বেকার বসে থাকতে দেয় না। অল্প সময়ের ভিতরেই নূতন পৃষ্ঠপোষক রটে গেল। এ লোকটা নাকি ভোজবাজীর মত রাতারাতি যে কোন মানুষকে যে কোন বিষয়ে জিনিয়াস করে ছাড়ে। কৃষ্টি সমন্ধে মিঃ পাকড়াশীর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর অবদান ব্যতীত প্রগতি সম্বন্ধে চিন্তাই বিড়ম্বনা। সব দিক বিচার করে মিঃ পাকড়াশী দেখলেন, কেবল ফুলের মত ক্ষণস্থায়ী জিনিস দিয়ে আর্টের প্রদর্শনী চলবে না তার সঙ্গে আরও কিছু চাই। তাঁর দ্রুতগামী চিন্তা তড়িৎবেগে তাঁকে ছোটাল অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট আর্টের দিকে, কারণ অ্যাব্‌শট্র্যাক্ট আর্টের কথায় কথায় ওরিজিন্যালিটির হুম্‌কি আছে, যা অন্ধকেও ছবি দেখিয়ে এবং বুঝিয়ে ছাড়ে। এইখানেই ইণ্টেলেকচুয়াল গুঁতোর চরম সার্থকতা। মিঃ পাকড়াশী ঠিক করে ফেললেন, তাঁর চিন্তাকে নিরেট রূপ দিয়ে যদি দাদাইজ্‌ম, সুররিয়্যালিজ্‌ম, কিউবিজ্‌ম এমন কি ন্যাকাইজ্‌ম ইত্যাদি যাবতীয় ইজ্‌ম-এর খোঁচা লাগিয়ে

দেওয়া যায়, তাহলে ঐ খোঁচা খাওয়ায় এমন আর্ট বার হবে যে যাদুকরকেও তাক লাগিয়ে দেবে। আসল কথা, ভবিষ্যৎকামী আর্ট এমনই হওয়া দরকার যাতে সুন্দর হবে চিরস্থায়ী এবং দূর ভবিষ্যতেও তার অর্থ থাকবে রহস্যের আড়ালে।

দ্বিতীয়বার প্রদর্শনী খোলার পর নয়া ইজ্‌ম ছোঁয়া আর্টের জয়ধ্বনি দৈনিক কাগজে হৈ হৈ পড়িয়ে দিল। বিলাতী অক্ষরে ছাপা খবর স্বদেশ' সাহেব মহলে যে-ভাবে সাড়া পড়িয়ে দিল তাতে প্রগতিপন্থী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পক্ষে প্রদর্শনীর নির্দিষ্ট সময়ে ঘরে থাকা আর সম্ভব হল না।

সমালোচকের ইষ্ট সাধনের জন্য ইজ্‌ম-এর ফর্মায় ফেলা আর্ট যখন ডঙ্কানিনাদের দাপট চালিয়েছে এবং সিনসিয়ারিটি, ওরিজিন্যালিটি, সিম্পলিসিটি ইত্যাদির আদর্শ যখন অ্যাবস্ট্র্যাক্ট গণ্ডীর মধ্যে ঘেরাও আরম্ভ করেছে, সেই সময় ফ্রীডম্ অফ এক্সপ্রেসানের দোহাই পেড়ে যা খুশি তাই করার ইস্তাহার জাহির হযে গেল। শিল্পীর রূপ পরিকল্পনায় যা-ই প্রকাশ হয়ে থাক, যা প্রকাশ্য তাই দেখার পর সমালোচকের উচ্ছ্বাস যদি শিল্পীর পথে না চলে ইচ্ছামত মোড় ঘুরে যায়, তাহলে সেই উচ্ছ্বাসের প্রকাশকে সমালোচকের নিজস্ব অবদান বলে মানতে হয়। শিল্পীর পরিকল্পিত মূর্তি বা ছবি এখানে সমালোচকের দৃষ্টিতে উপলক্ষ মাত্র। সমালোচকের কথাতে থাকে যাদুমন্ত্রের মোহন শক্তি, যার প্রভাবে বেরসিকও হয়ে যায় রসিক। যে তুলির সোজা উল্টোদিকও চেনে না, সেই শিল্পীর কাজই হয় ওরিজিন্যালিটির নিদর্শন। সিম্পিলিসিটি এই ফাঁকে নিজের বৈশিষ্ট্য গড়ে তোলে প্রত্যক্ষ নক্‌শার মধ্যে মহা-শূন্যের রূপ দেখিয়ে।

তুলির সোজা উল্টোর কথায় বলতে চেয়েছিলাম, রূপধরার প্রকরণে সঠিকভাবে তুলি ধরার উল্লেখ অবান্তর। প্রথম কারণ, প্রকাশ্য ফর্মে বাস্তবসম্মত কোন বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যের প্রত্যাশা এখানে থাকে না।

দৃষ্টান্তের প্রয়োজনে বলি মার্কিন দেশের অতি আধুনিক ছবি আঁকার পন্থা। খবর এসেছে, ছবি যখন কেবল নক্‌শা, তখন তুলির ব্যবহারই অপ্রয়োজনীয়; তাই সিম্পলিসিটির পিছনে ধাওয়া করতে গিয়ে শোনা যায়, কোন প্রখ্যাত শিল্পী নগ্ন নারীর দেহে বহুবিধ রঙের পোঁচরা লাগিয়ে মাটিতে বিছানো ক্যানভাসের উপর তাকে গড়িয়ে দিতেন এবং গড়াগড়ির ফলে যে কোন নক্‌শারই ছাপ পড়ুক তাতে নারী গঠনের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। তথাপি মেনে নিতে হয়, অদৃশ্য নারীর রূপই গড়াগড়িতে তার প্রতিচ্ছবি রেখে গিয়েছে ক্যানভাসের উপর।

যে সময় মডার্নইজ্‌ম আর্টের কেন্দ্রে গভীর সূক্ষ্মতত্ত্বের মধ্যে নেমে পড়েছে, সেই সময় অ্যাবসট্র্যাক্ট আর্ট মাথা চাড়া দিল। দর্শকদের মধ্যে যাঁরা ফুল সাজানোর প্রথাকে ছবির কেন্দ্রে নিয়ে ট্রেসপাসের মামলায় নেমেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দেখা গেল একজন বিশিষ্ট্য ব্যক্তিকে। বিশিষ্ট ব্যক্তিটি আমাদের পরিচিত শিল্পী, যাঁকে নিশ্চিন্ত মনে পুরুষ কিম্বা নারী বলার উপায় নেই। শিল্পী ফুল সাজানোর প্রথাকে নানাদিক থেকে দেখা শুরু করে দিলেন। একদিকে তাকিয়ে থাকার জন্য অপলক দৃষ্টি চোখকে বাষ্পাচ্ছন্ন করে ছাড়ছে এবং বাষ্পের বাড়তি অংশ চোখের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে অশ্রুবিন্দু হয়ে। দেখতে দেখতে শিল্পীর ভাব ও ভঙ্গী এমনই একটি স্তরে উঠল যে তিনি নিজেই প্রদর্শনী কক্ষের একটি বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠলেন। শিল্পীর চোখে জল দেখে একজন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং শিল্পীর হাতকে নিজের মুঠোয় নিয়ে বলা শুরু করলেন, বুঝেছি আপনি সেদিন প্রদর্শনী গৃহ ত্যাগ করার পর দেখা গেল, মিঃ পাকড়াশীর মেসে দিনের পর দিন দর্শনলোভী আগন্তুকদের ভীড় বেড়েই চলেছে। কাগজে ডঙ্কা-নিনাদের ফলে সমালোচকরা মিঃ পাকড়াশীকে অবতারের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। সত্যই আজ তিনি অবতার অবতারকে অভিনন্দন জানাবার জন্য বিভিন্ন সমাজভুক্ত কৃষ্টির

উন্নয়ন ব্রতীরা একের পর এক তাঁর বাড়ি চড়াও হতে শুরু করেছেন। দেখতে দেখতে দল বাঁধা শুরু হয়ে গেল, এবং কোন দল কার চাইতে বেশী ধুম করে মিঃ পাকড়াশীকে জনসাধারণের সামনে অবতার বলে স্বীকৃতি দেবে তার জন্য নানা বৈঠকে মন্ত্রণা চলতে লাগল। দ্রুত যশোলোভীদের মধ্যে একদল কালক্ষেপ না করে তাঁদের একদল প্রতিনিধিকে পাঠালেন সর্বসাধারণের সামনে মিঃ পাকড়াশীকে অবতার বলে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। এই দলের আয়োজনের মধ্যে হাঁকডাক পড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল প্রচুর, তাই বিশেষ স্থান ও সময় স্থির করার জন্য মিঃ পাকড়াশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ও অনুমোদনের দরকার ছিল।

কয়েকজন সদস্য রওনা হলেন মিঃ পাকড়াশীর বাড়ির দিকে। মিঃ পাকড়াশী কলকাতাতেই থাকেন। খ্যাতনামা ব্যক্তির বাসস্থান খুঁজতে হলে যে প্রশ পাড়ায় ঘুরতে হবে এইরূপ বিশ্বাস নিয়েই প্রতিভা-সন্ধানীরা ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা ঘুরতে ঘুরতে যেখানে এসে সঠিক ঠিকানার পাত্তা পেলেন সে জায়াটি একটি এঁদো গলি। গলির শোভার দিকে কর্তৃপক্ষের কোনদিন দৃষ্টি না পড়ায় সারা গলিতেই নিক্ষিপ্ত আবর্জনার স্তূপ। এইরূপ বিপদসঙ্কুল কেন্দ্রেও অবতার ভক্তরা কোন প্রকারে এগিয়ে চললেন, এবং অধ্যবসায়ে নিষ্ঠা থাকায় তাঁরা সঠিক ঠিকানায় এসে পৌঁছতে পারলেন।

মিঃ পাকড়াশী যেখানে থাকেন সেটি একটি সামান্য চাকরেদের মেস। বাসিন্দারা ভাগবাঁটরা করে ভাড়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। বাড়ির প্রবেশ পথে বালি-খসা পাঁচিল সংলগ্ন একটি দরজা, দর্শনপ্রার্থীরা সেখানে এসে উপস্থিত হওয়ার আগেই পিছন থেকে এলো গায়ে একজন মানুষ দরজার সামনে এসে ঠেলা মারতেই ভেজানো দরজা খুলে গেল এবং ভিতরে ঢোকবার আগে লোকটি জিজ্ঞাসা করল, শুনলাম্ আপনারা নাকি পাকড়াশীকে খুঁজছিলেন? ঐ তো, পাকড়াশী উঠোনের মাঝখানে তেল মাখছে।

বিস্ময়কর দৃশ্য! স্মার্ট পরিচ্ছদ-ধারী গোঁফদাড়ি ভূষিত সেই পাকড়াশীর এ কি অবস্থা! ছেঁড়া গামছা পরে অর্ধনগ্ন দেহের ওপর পরম নিষ্ঠার সহিত তৈল মর্দন করছেন।

এখানে খোলা দরজার পাশ দিয়ে রাস্তায় সব সময়ই কোন না কোন পথিক চলে তাই মিঃ পাকড়াশীর চম্‌কে ওঠার কিছু ছিল না, কিন্তু তিনি যখন বুঝলেন সুসজ্জিতা মহিলাসহ যাঁরা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা মিঃ পাকড়াশীরই দর্শনপ্রার্থী, তখন তিনি তেল হাতেই মুখ ঢেকে চিৎকার করে বলে উঠলেন, আমি না, আমি না।

বিপদ কি এইখানেই শেষ? একহাতে তিনি ছেঁড়া গামছা ধরে অপর হাতে তিনি আপন দেহকে তৈলাক্ত করছিলেন। এক হাতে গামছাকে ধরে রাখার প্রয়োজন ছিল, কারণ গোটা দেহ ঘের দিয়ে গামছার দুই ডগার মুখোমুখি হবার উপায় না থাকায় বাঁ হাতে বলপ্রয়োগে তাদের মিলনের ব্যবস্থা হয়েছিল। আচমকা, মার্জিত, সুসজ্জিত ব্যক্তিদের দেখে যখন আত্মপরিচয় আড়াল দেওয়ার জন্য দু'হাত তুলে মুখ ঢাকলেন, তখন যে ঘটনা ঘটে গেল তা অনুমান করাই ভাল। যাক যা ঘটার তা যখন ঘটেই গেল, তখন মুখ থেকে হাত নামিয়ে মিঃ পাকড়াশী দু'হাতে গামছা চেপে ধরে শালীনতার মর্যাদাকে শায়েস্তা করলেন।

যাঁরা দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা অগ্রসর হয়ে নমস্কারান্তে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিই কি মিঃ পাকড়াশী?

মিঃ পাকড়াশীর তখন হাত তুলে প্রতিনমস্কার জানাবার অবস্থা ছিল না, কারণ তাঁর দুই হাতই তখন গামছা সামলানোয় আটক পড়েছে। একে ছেঁড়া গামছা, তার উপর দুই মুখ মেলানোর জন্য যে শক্তির প্রয়োগ হয়েছিল, তাতে টান সহ্য করতে না পারায় গামছা তার ওরিজিন্যাল রূপ আরও বেশী করে বদ্‌লাতে লাগল এবং গামছা ছেঁড়ার আওয়াজে মহিলারা অকস্মাৎ সামদ্রিক

প্রথায় রাইট অ্যাবাউট টার্ণ নিয়ে একেবারে রাস্তায় এসে উপস্থিত হলেন। গত্যন্তরে পুরুষরাও তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য হ'লেন।

এই প্রসঙ্গে উৎসাহী মহিলাটি সম্বন্ধে কিছু বলার আছে। তিনি পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ঘোরতর আধুনিক-পন্থী, গুছিয়ে নিরাবরণ হওয়াই তার যথেষ্ট প্রমাণ। সুতরাং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে খুঁটিনাটির বিশদ বিবরণের প্রয়োজন দেখি না। বাড়ি ফেরার পর অবতার দর্শনে হতাশা এই মহিলাটিকে এমনভাবেই সবকিছুর উপর বিতৃষ্ণা এনে দিল যে বেঁচে থাকাই তাঁর কাছে বিড়ম্বনা হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত তাঁর মানসিক অবস্থা যেখানে এসে উপস্থিত হল, সেনে আত্মপীড়ন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মৃত্যুই চরম কাম্য হয়ে উঠল, ফলে যাঁর জন্য এই মানসিক অবস্থা তাঁকে জানিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন থাকায় লিখতে হল, "তোমার জন্যই সব আনন্দ থেকে আজই নিজেকে বঞ্চিত করতে চলেছি। তোমাকে যা ভেবেছিলাম আসলে তুমি মোটেই তা নও ; তুমি কৃষ্টি সেবকদের মধ্যে একজন সার্থক ভণ্ড। এই ভণ্ডামি ধরা পড়ল সেদিন তোমার বীভৎস রূপ দেখে। তুমি আসলে ঐ, মানে, বীভৎস। এইটুকু জেনে রেখ, তোমাকে যদি মনোমত করে দেখতে পেতাম, দুটো কথা বলার সুযোগ পেতাম। মনে অনেক আবেগ জড়ো হয়েছিল, সেগুলি তোমার সামনে উজাড় করে দিতে পারতাম, তাহলে আজ পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া আমার কাছে একান্ত আবশ্যক হত না। আমি মরব এবং আমার মৃত্যুর জন্য তুমিই হবে দায়ী।" এরপর মহিলাটি মৃত্যুকামনার শেষ কথা লিখে কনফিডেনশিয়াল এবং পার্সোন্যাল মার্কা খামে ভরে বিশ্বাসী পত্রবাহকের সাহায্যে পত্রটি যথাস্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিলেন।

মর্মান্তিক অবস্থা ! সেই গোপনীয় পত্র মিঃ পাকড়াশীর হস্তগত হয়েছে এবং বক্তব্য পড়ে যা জেনেছেন, তা কোন লোককে বলারও উপায় নেই, কারণ মহিলাটি তাঁকে একান্ত বিশ্বাস করেই খামের

উপর লিখেছেন কনফিডেনসিয়াল এবং পারসোন্যাল। সুতরাং অন্য কারো পরামর্শ ছাড়াই যা কিছু করণীয় তা তাঁকেই করতে হবে, অন্যথায় যে নারী তাঁর জন্য মৃত্যুকে বরণ করতে চলেছেন, তাঁকে বাঁচানো যাবে না। কোথায় এবং কি ভাবে এই অবাঞ্ছনীয় ঘটনাটি ঘটবে তা চিঠিতে লেখা থাকলে কালবিলম্ব না করে একটা কিছু ব্যবস্থা করা যেত, কিন্তু এদিক দিয়েও মহিলাটি মিঃ পাকড়াশীকে হতাশ করেছেন।

যাই হোক্, যা করণীয় তা নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করেই যখন করতে হবে, তখন যেমন করেই হোক আত্মহত্যার স্থান ও সময় বার করা দরকার। আত্মহত্যার পুরাতন ঘটনার ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়, টাওয়ার থেকে লাফিয়ে পড়া নিজের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা, বিষ খাওয়া, গলায় দড়ি দেওয়া, আরও কত রকমের পন্থাই না আত্মহত্যার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু ওগুলি ব্যাকডেটেড যা ঐ আধুনিকার কোন কাজে লাগবে না বলেই মিঃ পাকড়াশীর ধারণা। চিন্তাটি আরও গড়িয়ে যেতে হাল ফ্যাশানের আত্মহত্যার কথা মনে পড়ল—জলে ডুবে মরা। জনরব কলকাতার লেকই নাকি এইরূপ কামনা সিদ্ধির পীঠস্থান। মিঃ পাকড়াশীর আর দ্বিমত রইল না যে, আত্মহত্যার মহোৎসব পীঠস্থানেই ঘটতে চলেছে।

আসন্ন মৃত্যু থেকে নারীকে উদ্ধার করতে হলে এখুনি একটা ব্যবস্থা করতে হয়, কিন্তু গোল বাধল মহিলাকে চেনা নিয়ে। তৈলমর্দনকালীন গামছা পরা অবস্থায় চকিত চাহনির সাহায্যে যেটুকু মুখশ্রী দেখার সুবিধা তিনি পেয়েছিলেন, তাতে মনে গেঁথে রাখার মত অবসর পাননি। গামছার উৎপাতে তিনি এমনই বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন যে সবদিক সামলাবার আগেই মহিলাটি একেবারে মুখ ফিরিয়ে রাস্তায় গিয়ে হাজির হলেন, তারপর এই কালঘাম ছোটানো চিঠি।

মিঃ পাকড়াশী কব্জী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সময় তখন

শুভলগ্নের দিকে ঝুঁকেছে। আপ-টু-ডেট ফ্যাশানের রীতি অনুসারে লেকে ডুবে মরতে হলে শুভক্ষণ মেনেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন হয়ে থাকে। এই সুভক্ষণের সঙ্গে গোধূলী লগ্নের যোগ আছে। কাজে কাজেই তাঁকে গোধূলী লগ্নের অপেক্ষায় থাকতে হল এবং উপযুক্ত সময়েই তিনি গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

লেকের ধারে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে ঘুরতে মিঃ পাকড়াশী জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হলেন এবং দেখলেন একটি মহিলা আলুথালু বেশে একলা একটি বেঞ্চে বসে আছেন তাঁর দৃষ্টি স্থির জলাশয়ের দিকে। মহিলার অনিমেষ দৃষ্টির পিছনে যে চিন্তা ছিল তা আত্মোৎসর্গের আয়োজনকে জড়িয়ে থাকা স্বাভাবিক। মিঃ পাকড়াশী দ্বিধাহীন চিত্তে সহজ পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন নারীর দিকে এবং বেঞ্চির বিপরীত দিকের কোণায় বসার আগে ভদ্রাচারের কানুন মেনে জিজ্ঞাসা করলেন, কোণটুকুতে বসতে পারি কি ?

মহিলাটি মিঃ পাকড়াশীর দিকে তাকিয়ে কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু এমনভাবেই ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন যার ডবল মানে হতে পারে। প্রথম, চিন্তায় বিঘ্নর জন্য বিরক্তি। দ্বিতীয়, একটু দূরেই আর একটি খালি বেঞ্চি ছিল, যেখানে ভদ্রলোকের বসার জন্য কারুর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না।

ভ্রূ কুঞ্চনে যে ইঙ্গিতই থাক মিঃ পাকড়াশী ধরে নিলেন, এই দৃষ্টির সঙ্গে সেদিনকার অপ্রস্তুত অবস্থায় পরিচয়ের সঙ্গে কেমন যেন একটা মিল পাওয়া যাচ্ছে, আর এই মিলই যে উভয়ের মাঝে শুভমিলনে ডাক দিচ্ছে না এমন কথা বলা যায় না।

মিঃ পাকড়াশী সুবিধাটি কাজে লাগাবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। তিনি শুনেছিলেন, এখানে অপরিচিত নরনারী অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে বসলেও সন্দিগ্ধ হওয়া নিয়ম নয়, বরং একই বেঞ্চে কোনরূপ ব্যবধান থাকলে অনেক সময় মনোমালিন্যের প্রমাণ বলেই ধরা হয়। ফলে তিনি ফ্রগ-জাম্পিং-এর অনুকরণে একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। বসে বসে চলার গতি মহিলাটির

কাছে অস্বস্তিকর হয়ে উঠল, কিন্তু তার বাহ্যিক প্রকাশ কিছু না থাকায় মিঃ পাকড়াশী আরও একটু এগিয়ে এসে বললেন, আমি জানি, কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আপনি এসেছেন, আর সত্যি বলতে তারই টানে আমাকেও আসতে হয়েছে। কিন্তু আমি আপনার মনোস্কামনা পূর্ণ হতে দেব না। আপনি এই বিরাট ত্যাগ দ্বারা জানাতে চেয়েছেন···মানে · সেদিন আমাকে গামছা পরা অবস্থায় দেখে, মানে—

মহিলা : আপনার মানের মানে যে কি হতে পারে তা বুঝলাম না। আপনি কি সব আবোল তাবোল বকছেন? আর আমার দিকে অমন করে এগিয়েই বা আসছেন কেন? আপনি কাছ থেকে সরে যান।

যে সময় মিঃ পাকড়াশী বসা অবস্থায় মহিলার দিকে একটু একটু করে এগুচ্ছিলেন, তখন মহিলা উভয়ের মাঝে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য ক্রমেই বেঞ্চির বিপরীত দিকে সরে যাচ্ছিলেন, তথাপি তিনি মিঃ পাকড়াশীর গতিকে থামাতে পারেননি। এবং শেষপর্যন্ত বেঞ্চির বিপরীত দিকে তিনি এতটা সরে গিয়েছিলেন যে তাঁর দেহের অর্ধাংশের উপর বেঞ্চির বাইরে চলে গিয়েছিল।

আধঝোলা অবস্থায় মহিলা যখন নিজের দেহভার সামলাবার জন্য ব্যস্ত, তখন হঠাৎ মিঃ পাকড়াশী দেখলেন, একটি সাজোয়ান পুরুষ বেঞ্চির একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটিকে দেখলেই মনে হয় কিছু একটা মতলব আছে তার। ক্রমাগত মহিলাটিকে আসনচ্যুত করার চেষ্টা দেখে, লোকটি বুশ শার্টের কাটা হাতাকেই আরও খানিকটা উপরে তুলে দিল। যার সহজ অর্থ বিপদগ্রস্তা নারীকে অভয় দান।

এইরূপ ঘটনার অভিজ্ঞতা মিঃ পাকড়াশীর সংগ্রহে ছিল, তাই আত্মহত্যালোভী নারীর জীবন রক্ষা অপেক্ষা 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' স্মরণীয় প্রবাদ বাক্যটি তাঁর কর্তব্যের সিদ্ধান্তকে মোড় ঘুরিয়ে দিল। চোঁচা দৌড় দিয়ে পালিয়ে পার পাবেন না জানতেন

বলেই, আগন্তুককে সসম্মানে নারী ও তাঁর নিজের মাঝখানে তাকে বসার জন্য অনুরোধ জানালেন।

এমনতর ঔদার্যের দৃষ্টান্ত বিরল, কারণ বসা অবস্থায় মিঃ পাকড়াশী নিজেকে ঠেলা মেরে যেখানে নিয়ে এসেছিলেন সেখানে অপরিচিতা মহিলা ও পাকড়াশীর দেহের মাঝে আদৌ যদি ব্যবধান কিছু থেকে থাকে তা কল্পনার বস্তু। সুতরাং মিঃ পাকড়াশীর অনুরোধ রক্ষা করতে হলে লোকটিকে উভয়ের জানুর উপর বসতে হয়। অনুরোধ শুনে লোকটির ধারণা জন্মাল যে, সে ব্যবসার হিসাবে ভুল করেছে। খুব সম্ভবত বুশ শার্ট পরা মানুষটি মিঃ পাকড়াশীর সঙ্গে গোল বাধিয়ে ভীড় জড়ো করে ছিনতাইয়ের হাত সাফাইটি কাজে লাগানোর ইচ্ছায় ছিল, কিন্তু ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করার আগেই সবকিছু পণ্ড হয়ে যাওয়ায় লোকটি বলে বসল, তুৎতোর! আজ আর কিছুই হল না। তারপর অধিক বাক্য ব্যয় না করে স্থান পরিত্যাগ করল।

মিঃ পাকড়াশীও সঙ্গে সঙ্গে অতি নিকট আত্মীয়ের মতই পূর্ব-বর্ণিত মহিলাকে বললেন, একটু বস, আমি এখুনি অ সছি। বলে স্থান ত্যাগ করলেন।

যাই হোক, খ্যাতনামা ব্যক্তি নারীর আত্মহত্যাজড়িত সম্ভবপর পুলিশের হানা থেকে ছাড়ান পেলেও, সমালোচকের পক্ষপাতিত্ব কৃষ্টির দরবারে মিঃ পাকড়াশীকে এমন ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে যে, তাঁর উপস্থিতি না হলে বহু প্রতিষ্ঠানের আয়োজন ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা থাকে, সে চিত্রপ্রদর্শনী থেকে আরম্ভ করে বিবাহোৎসব, শ্রাদ্ধ বাসর ইত্যাদি যাবতীয় অনুষ্ঠানে মিঃ পাকড়াশীকে না হলে চলে না।

সেদিন মিঃ পাকড়াশীর ডাক পড়ল নবতম গৃহশয্যার প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে। বৃহৎ প্যাণ্ডেলে নানা ঢঙে ছোট-বড় অস্থায়ী ঘর তৈরী হয়েছে। সর্বত্রই দেখা যায় নয়া আমদানী রুচির বিচিত্র

নিদর্শন। আসবাব-পত্র বিশেষ ভাবে সাজিয়ে পরিবেশকে নূতন রুচির আদর্শে কিভাবে সুন্দর করে তোলা যায়, তা জনসাধারণকে জানাবার জন্যই এই বিশেষ আয়োজন।

প্রদর্শনীতে পুরুষ ও নারীর বিচিত্র কেশবিন্যাসের ভীড়। নারীর কবরী বন্ধনে ঝুড়ি খোঁপার উত্তুঙ্গ চূড়ার পর চূড়া পার না হলে দর্শকের দৃষ্টিকে ঘরের ভিতরে কাজে লাগাবার কোন উপায় নেই। ঝুড়ির মোটবহনকারীদের মধ্যে যেসব নারী স্লিমত্ব প্রাপ্তি হয়েছে, তাঁদের প্রকৃতিকে নির্দয় বলতে হয়, কারণ এই জাতীয় মহিলারা খুব সম্ভবত ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর সহায় হতে গিয়ে নারীত্ব বর্জন করেছেন, প্রমাণ তাঁদের ওয়ান ডাইমেনশনাল ফিগার। এর ফলে সন্তান জন্মগ্রহণের পর যে তার ন্যায্য আহার থেকে বঞ্চিত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যাই হোক, দর্শকদের মধ্যে মিঃ পাকড়াশীর একটি বিশিষ্ট স্থান থাকায় ভিতরে প্রবেশের কোনই অসুবিধা হল না, ফিতে কাটার পর পথ ছাড়ুনের বাণীর দ্বারা উদ্যোক্তারা সহজেই মিঃ পাকড়াশীকে সফাপতির আসনে বসিয়ে দিলেন। শঙ্খবাদন ও অভিনন্দন গীতির পর মাল্যদানের পালা এসে পড়ল। পরে অনুষ্ঠানের কর্মসচিব মিঃ পাকড়াশীকে অনুরোধ করলেন তাঁর ভাষণের জন্য।

ভাষণের অনুরোধ তাগিদ দেওয়ায় মিঃ পাকড়াশী কৃপার শক্তি নিয়ে বীরদর্পে উঠে দাঁড়ালেন, এবং মুখস্থ করা বক্তব্যকে সবাক করে তোলায় প্রবৃত্ত হলেন : প্রথমেই আপনাদের কাছে আমার ধৃষ্টতা সম্বন্ধে ক্ষমা চাইছি, কারণ যে বিষয়ে আমাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে সে-বিষয়ে আমার অজ্ঞতা অসাধারণ, তথাপি জনসাধারণকে কয়েকটি সত্যের তথ্য দেবার জন্য আমার কর্তব্যকে অস্বীকার করতে পারছি না। সুতরাং আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে অযথা বেশী কথা বলে আপনাদের ধৈর্যের পরীক্ষা চালাব না।

আপনারা সকলেই জানেন আমরা নবযুগের চেতনায় নূতনকে

অভ্যর্থনার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা এটাও জানেন যে বাঁচতে হলে সুন্দরকে কাছে না রাখলে ঘরোয়া আবেষ্টনীকে সুস্থ করার উপায় নেই। আমরা সকলে পুরোপুরি বাঁচতে চাই তাই মনের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ঘরের পরিবেশে যে-সব আসবাব-পত্র আমরা ব্যবহার করে থাকি, তা গতানুগতিকতার অনুকরণে আর চালানো চলবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারাও এবিষয়ে একমত। গৃহশয্যার উপকরণই যে আমাদের কৃষ্টিসাধন এবং মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার একটি বিশেষ সহায় তার সাক্ষাৎ প্রমাণ পাবেন আজকের প্রদশনী থেকে। এই প্রদশনীর প্রভাব আপনাদের অন্তরে যদি আঁচড় কাটতে পারে, তাহলে প্রাচীন রুচির কয়েদখানা থেকে আপনারা বাইরের মুক্ত বায়ুর সন্ধান পাবেন। সুতরাং আজকের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সাফল্যে কেবল ঘরোয়া আষ্টেনীরই শ্রীবৃদ্ধি হবে না এর উপযুক্ত সার্থকতায় আমরা তেজীয়ান করে তুলব দুর্বল মনকে প্রাচীনের নকলনবিশী থেকে। বাঁচতে হলে কৃষ্টির দৈন্যকে হটাতে হবে, এটা সমগ্র জাতীর দাবী, আশাকরি এ-দাবী সমর্থন থেকে বঞ্চিত হবে না।

মিঃ পাকড়াশীর আরও অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু অনুষ্ঠানের কর্মসচিব তাঁর কানের কাছে এসে জানালেন যে প্রোগ্রাম অনুসারে তিনি বেশী সময় নিয়ে ফেলেছেন, সুতরাং তাঁদের জলযোগের জন্য ভিন্ন ঘরে যাওয়া দরকার। এরপর চলতি নিয়মে হাততালি ইত্যাদির পর সভা ভঙ্গ হল।

ভীড় কমে যেতে আমার মত একজন অবুঝ গৃহপ্রবেশের অধিকার পেল। দেখলাম মিঃ পাকড়াশী বেশ বিজ্ঞের মত প্রদর্শনী কক্ষে ঘুরছেন, এবং বিভিন্ন পত্রিকার ফটোগ্রাফাররা ক্যামেরার অভ্যন্তরকে ভরপুর করে তুলছে। মিঃ পাকড়াশীর সঙ্গে রয়েছেন অনুষ্ঠানের কর্মসচিব ও সেই ডাগর ডোগর মেয়েটি, যিনি মিঃ পাকড়াশীকে মাল্যদান করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এখানেও মিঃ পাকড়াশীর অবস্থা শোচনীয়। বৈরাগ্যসাধনের দৃঢ়

পণ ডাগর ডোগরের ছোঁয়াছুঁয়িতে বেসামাল হতে চলেছে। মিঃ পাকড়াশীর সংযম হারা দৃষ্টি দেখে বেশ বোঝা যায় তাঁর অন্তর দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একদিকে সব কিছুকে মায়া বলার তাগিদ, অপরদিকে বাস্তব জড়ানো ম ম্মাকেই প্রত্যক্ষ সত্য বলে মানার বাসনা। মিঃ পাকড়াশী নিজের মন নিয়ে বোঝাপড়া করতে থাকুন, আমরা এই অবসরে প্রদর্শনীর বিশেষ দ্রষ্টব্যগুলি দেখে নিই।

প্রথমেই নজর পড়ল সিলিং ল্যাম্পের দিকে, অবাক কাণ্ড। একটি অর্দ্ধদগ্ধ হবিষ্যির মালসা কালো ধোঁয়ার চাপ নিয়ে মেলায় কেনা বাহারী সিকায় ঝুলছে, সিকার তলায় নীল লাল রঙে চোবানো পাটের ঝালর, এবং মালসার ভিতর গোপন করা ইলেকট্রিক বাল্ব—তারই আলোক রশ্মি সিলিংয়ের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টি নামিয়ে দেখি ঠাকুরঘরের পিলসুজ দাঁড়ানো অ্যাশ ট্রে-র কাজ সারছে। পিলসুজ যে সত্যই অ্যাশ ট্রে হিসাবে হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা প্রমাণের জন্য একটি আধপোড়া উচ্ছিষ্ট সিগারেটও এতে রাখা আছে। পিতলের পিকদানী হয়েছে ফ্লাওয়ার ভাস। পিতলকে পালিশ করে চমকদার করলে কি হবে, যাঁরা পাত্রটির ব্যবহার জানেন, তাঁরা ফুলকে জবরদস্তি করে কলঙ্কের ছোঁয়া লাগানোয় নিশ্চয়ই খুশি হবেন না। তা না হোন; একটি সময় আসবে যখন পিকদানীকে পুষ্পাধার করায় লোকে নোংরায় সন্নিধ্যেই ফুলের পবিত্রতা খুঁজে পাবে। পিক-দানীর পরেই দেখি বড় বড় ঝুড়ির আধখানা কেটে কোনপ্রকারে মোচড়ানো লোহার পায়ার সাহায্যে চেয়ার করা হয়েছে। মোটবাহী কুলিকে ক্লান্ত অবস্থায় দেখেছি ঝুড়িকে উপুড় করে বসতে; কিন্তু সোজা অবস্থায় ড্রইং রুমে ঝুড়িকে চেয়ার করায় নতুনত্বের দাবীকে বাহবা দিতে হয়। ঝুড়ি চেয়ারের সামনে সোফা, আছোলা বাঁশ দিয়ে তৈরী, তবে এক্ষেত্রে নতুনের

সন্ধানীকে হৃদয়বান ব্যক্তি বলতে হয়, কারণ গাঁটযুক্ত বাঁশের উপর নরম গদীর ব্যবস্থা আছে।

ভিন্ন ঘরে ঢুকে দেখলাম, কোথাও কিছু নেই, সব ফাঁকা, কেবল একটি মাদুর বিছানো। দেওয়ালে একটি অতি বৃহৎ কুলপী করা হয়েছে, যার ভিতর প্রদীপ ছাড়া মাটির তৈরী ফোক আর্টের ঘোটকও রাখা আছে। ঘোটকের নকশা অভিনব. আনসফিস্টিকেটেড (জুভেনাইল) চিন্তার এমন উৎকর্ষ কমই দেখা যায়। মাদুরের পাশেই একটি কাণাকড়ি বাঁধা খেলো হুঁকো, বোঝা গেল ধুম-পানের পাত্রটি বিশেষ জাতিভুক্ত এবং ঘরটি পল্লীশ্রীর একটি বিশেষ অঙ্গ বলে প্রচার করার জন্য প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে।

তৃতীয় ঘরে ঢুকে দেখলাম একেবারে সাহেবী চালে ঘর সাজানো। দেওয়ালে ফ্রেমের মধ্যে বৃহৎ ক্যানভাস, ছবি বলার সাহস হয় না, কারণ ক্যানভাসে কিছু আঁকা ছিল না, যা ছিল, তা গুণে তিনটি সুস্পষ্ট ফুটো। ছবিটির তলায় লেখা আছে—কল্পনা। কল্পণাকে খাটাতে গেলে কোথায় গিয়ে পৌঁছাব তার ঠিক নেই, কাজেই বিপদসঙ্কুল চেষ্টা থেকে বিরত হলাম। অন্য ঘরে গেলাম। এখানে দেখি আসবাবপত্রের মধ্যে আগন্তুকদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থাও চমকপ্রদ। চেয়ার, লেগ টেবিল, সেন্টার পিস্, সোফা, অ্যাস-ট্রে সবই আছে, কিন্তু কোন্‌টি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা লেখা নেই ; ফলে আমার মতন একজন আনাড়ী ঘরে ঢুকে আরামের জন্য বসবার চেষ্টা করলে হয়তো দেখবে হরিণের শিঙের উপর রাখা একটি পিতলের থালাতেই বসে পড়েছে। থালাটি আসলে পেগ টেবিলের জন্য রাখা হয়েছে। টেবিলের উপর রাখা এ্যাস্-ট্রের মধ্যে নতুনত্ব আছে। বড় বড় ঝিনুক কিছুর ঠেকায় নৌকার আকার নিয়ে ভস্মাধার হয়ে আছে। কার্পেটের নক্‌শাও বিচিত্র—কেবল ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ ও গোলাকার রেখার দ্বারা ভরা। পাছে কেউ নক্‌সার মানে বোঝার জন্য প্রয়াসী হন, তাই এই অর্থহীন ডিজাইন। নতুনের চাপে মাথায়

যখন প্রায় ঘোর লেগে গিয়েছে, বুঝলাম এইরূপ ঘরোয়া পরিবেশে বাঁচতে হলে সবল স্নায়ুর প্রয়োজন আছে। নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য ঘরে যাব, এমনি সময় দেখি মিঃ পাকড়াশী রেস্তোরাঁ কামরা থেকে বহু লোক পরিবেষ্টিত হয়ে সেই ডাগর-ডোগর মেয়েটির সঙ্গে বেরিয়ে আসছেন, বুঝলাম মিঃ পাকড়াশী কপালের সঙ্গে বোঝাপাড়ার জন্য এখনও ধৈর্য হারাননি।

অনেক দিন হয়ে গেল সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সমিতির বৈঠকে যেতে পারি নি। প্রেসিডেন্ট সাহেব বিলাতে পাড়ি দিয়েছেন। লণ্ডনের কাছাকাছি কোন কোন এক শায়ারে একটি বৃহৎ মনোমত ভিলা কিনে সেইখানেই বসবাসের ব্যবস্থ' করেছেন। উপস্থিত সঙ্গীত ও সাহিত্যের চর্চা ছাড়া ফুলবাগানের প্রতি বেশ আসক্ত হয়ে পড়েছেন। সন্ধ্যায় বাগানে তিনি একলাই পায়চারী করেন। আগের দিনে মহাশ্বেতা প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে তাঁর ভাড়াটে বাড়িতে আসতেন, এখন তিনি প্রফেসর চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহের আইনে আটক পড়ায় স্বামী গৃহেই রয়ে গেলেন এবং গৃহস্থালীর ধর্মে এমন ভাবেই আত্মনিয়োগ করলেন যে প্রেসিডেন্ট সাহেবকে চিঠি লেখারও সময়াভাব ঘটে গেল। লিলির খবরও অনেকদিন পাওয়া যায়নি, তবে কখনও-সখনও প্রফেসর চৌধুরী লিলিকে চায়ে বাড়িতেই ডাকতেন। এতে মহাশ্বেতা আপত্তি তোলেননি। ঔদার্য্যের প্রয়োজনে ক্রিয়েটিভ আর্টের যেসব সিক্রেট বলা হয়নি, সেগুলির আলোচনার সুবিধা দেবার জন্য নির্লিপ্ততার আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফিফির কথা ভেবে লাভ নেই, সে মেরী উইডোর নেশায় নিশ্চয়ই ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। মোট কথা, বিবাহ বিচ্ছেদের দরুণ অর্থ সমাগমে ঘাটতি পড়ায় সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সমিতির কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সাহেবই এদিক দিয়ে উদাস। সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সমিতির কর্ম-

ব্যস্ততা ঝিমিয়ে যাওয়ায় মিঃ পাকড়াশীও কেমনতর হয়ে গিয়েছেন ; সেই সঙ্গে নতুন উপসর্গ এসে জুটলো ; সেই ডাগর ডোগর মেয়েটি। ফলে মিঃ পাকড়াশী বুঝতে পারছিলেন কচি ও কাঁচার এলাকায় টহল দেবার অধিকার তাঁর নেই ; তার উপর যৌবনও তাঁর বয়েসকে পাশ কাটিয়েছে।

ডাগর ডোগর মেয়েটি সভা-সমিতিতে পরপুরুষকে বেহিসাবী মাল্যদান করলে কি হয়, আসলে তার শিক্ষাদীক্ষা পিছিয়ে পড়া প্রাচীন-পন্থীদের ঘরোয়ানা চালে বাঁধা। এখানে ঘরোয়ানা চাল বলতে জানাতে চেয়েছি, এখনও মেয়েটির পরিবারে পিসীমা, খুড়ীমারা শাস্ত্রসম্মত ঘোমটা দিয়ে থাকেন এবং নতুন বৌ এলে হাইহিল পাদুকার পরিবর্তে মল ব্যবহার করা নিয়ম। এমন মল যে প্রতি পদক্ষেপে বেজে ওঠে নববধূর চলাকে জানিয়ে দেবার জন্য। ডাগর ডোগরের আকর্ষণ এমনভাবেই মিঃ পাকড়াশীকে টানছিল যে, মনের কথাকে কায়েমীভাবে ছোঁয়ার নাগালে আনতে না পারলে আর চলছিল না। অপর দিকে প্রেমের কারবারে ইতিপূর্বে ডাইরেক্ট অ্যাকশান করতে গিয়ে ফিফির কাছ থেকে যে প্রতিদান পেয়েছিলেন, তা মনে থাকায় সায়েন্টিফিক ডিপ্লোমেটিক চালে গৌরচন্দ্রিকার আশ্রয় দিতে হল। ভালবাসার উচ্ছ্বাস সহজবোধ্য হয়ে আসছে বুঝলেই, গভীর জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বের বিশ্লেষণ কথার ফাঁকে চালিয়ে দিতে লাগলেন। এই প্রথায় প্রেমের রসকে বচকে দেওয়ায় বক্তব্যের অর্থ যখন মেয়েটির কাছে অবোধ্য হতে লাগল, তখন মেয়েটিকে বলতে শোনা গেছে. কি যে বল, বুঝতে পারি না। যাক, শেষ পর্যন্ত যা ঘটার ছিল তাই ঘটল, মিঃ পাকড়াশী একদিন বেঘোর বিপাকে ভবিতব্যের বিধান মেনে নিলেন অর্থাৎ বেহিসেবী মাল্যদান, বিবাহের মন্ত্রের সাহায্যে তাকে সাত পাক ঘুরিয়ে ছাড়ল। এখন মিঃ পাকড়াশী নববিবাহিতা বধূকে নিয়ে সদাই সন্ত্রস্ত। প্রগতির তাড়া এদিকে পৌছালে, বিবাহের মন্ত্রে, বজ্রবাঁধন, ফস্‌কা গেরোর মত খুলে গেলেই তো

চমৎকার। পরকীয়ার ব্যাপারে উদারপন্থী হওয়া চলে, তাই বলে স্বদেশী চালে বিয়ে করা বৌকে নিয়ে কি ঐসব খেলা সম্ভব? সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সমিতিতে পরোক্ষ ঘটনাই ছিল প্রগতিশীল আদর্শকে মানার একটি বিশেষ অঙ্গ, তা না হলে ডাইভোর্সের বাড়তি চাঁদায় ক্লাব চলে?

বিবাহের পর কিছুদিন মিঃ পাকড়াশীর বেশ কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু কিসের অভাবে তিনি বুঝছিলেন আনন্দের গোড়ায় গলদ রয়ে গিয়েছে। ক্রমে শান্তিতে দিন গুজরানো মিঃ পাকড়াশীর পক্ষে কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠল। কষ্টসাধ্যই বলব, কারণ এতদিন যে প্রগতির আদর্শ তাঁকে কৃষ্টির দরবারে খাড়া করে রেখেছিল, সেই আদর্শই নানা ঝড়ঝাপটায় ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। মিঃ পাকড়াশী বেশ বুঝতে পারছিলেন, যে বাস্তবের সত্য তাঁকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে চলেছে যেখানে প্রগতি-শীলতার আদর্শ তাঁকে আশ্রয় দিতে চাইছে না। ক্রমান্বয়ে তিনি দেখলেন কবিতা যেভাবেই মনকে উর্ধ্বস্তরে তুলুক, যে প্রেমের আদর্শই গড়ে তুলুক, আসলে নরনারীর মাঝে প্রেমকে জীইয়ে রাখতে হলে কথার সঙ্গে ছোঁয়ারও দরকার আছে। এটা আদিম প্রবৃত্তির দাবী। ক্রমপরিবর্তনশীল ফ্যাশান যেভাবেই নতুনকে স্থায়ী করার চেষ্টা করুক, ফ্যাশানদত্ত আবহাওয়ার বেগ শেষ পর্যন্ত নতুনকে উড়িয়ে নিয়ে আবার পুরাতনের আশ্রয় দেবায় জন্য। পুরাতন হল আদিম প্রবৃত্তি, যা বুভুক্ষুকে তাগিদ দিতে থাকে আহারের জন্য: ক্ষুধার তাড়নায় যে জীব অতিষ্ঠ, তার কাছে ভালমন্দের মাপকাঠির দ্বারা অন্নকে পৃথক করা চলে না। এইখানেই উচ্চ আদর্শবদ্ধ বিচারের ফল বেকার।

ডাগর ডোগর মেয়েটি ইতিমধ্যে নিজের শরীরে যৌবনকে ডেকে এনেছে। যৌবনও এল রীতিমত হাঁকডাকের সাড়া পড়িয়ে। সাড়ার মধ্যে ছিল অদমনীয় মত্ততা। অপরদিকে যৌবনের তাগিদে অতিষ্ঠ নারী কাছে আসার চেষ্টা করলে মিঃ পাকড়াশী ছোঁয়ার

নাগাল থেকে দূরে থাকার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। ফলে একদিকে একজন স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস প্রকাশের জন্য অধীর, অপরদিকে আর একজন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করেই ভাবতেন শিকার পাওয়া গিয়েছে। এইভাবে যখন অসামঞ্জস্যের গতি পাকড়াশীর পরিবারে প্রবহমান, সেই সময় ঘরোয়া কাজের খুঁটিনাটি ফাঁকে কোনদিন শোনা গেল সোমত্ত বধূ বলছে—কিগো তোমার কবিতা লেখা হল? উনানের আগুন নিভে যেতে বসেছে। সিদ্ধ জল খেয়েই দিন কাটাবে নাকি? ঘরে যে চাল বাড়ন্ত, সে খবর কি রাখ? অন্য কোন সময়ে কোন কারণ থাক বা না থাক, রুচি সম্পন্নাদের আদর্শ অগ্রাহ্য করে মেয়েটি বলে বসত তোমার এ সংসার চালানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অমন করে সব সময় তুমি যদি খাতা লেখ, আর আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বক, তাহলে সত্যই আমি বাপের বাড়ি চলে যাব। আপন মনে বিড়বিড় করে যে মানুষ বকে আর কেবল খাতা লেখে, এমন কি কাছে এসে একটা কিছু ··বাক। তাকে পাগল বলব না তো কি? কেবল কি দাড়ি গোঁফ থাকলেই পুরুষ হয়? তুমি ঐ মুদির খাতা নিয়ে হিসাব কষ। আমি তোমার এখান থেকে চলে যাব।

গৃহস্থালী কাজের সঙ্গে মেয়েটি আজকাল কারণ থাক বা না থাক, মুখ ঝামটা না দিয়ে কথাই বলতে পারে না। দেখতে দেখতে এমন একটি সময় এল যখন উভয়ের মাঝে কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে গেল। চরম ঘটনা ঘটল প্রিমিটিভ ডাইভোর্সের প্রত্যক্ষ প্রমাণে, অর্থাৎ বিনা নোটিশে একেবারে স্বামীগৃহ ত্যাগ। সেদিন মিঃ পাকড়াশী কৃষ্টিপ্রচারের কর্তব্য শেষ করে বাড়ি ফিরে দেখেন দরজার উপর বাইরে থেকে শিকল লাগানো। ভাবলেন হয়তো পাড়া ঘুরতে গিয়েছে। কিন্তু রাত নটার পর একলা পাড়া ঘোরা তাঁর গৃহিনীর পক্ষে সহজসাধ্য কাজ নয়। তিনি ঘরে ঢুকে দেখলেন প্রগতির কারবার তাঁর ঘরেও শুরু হয়ে গিয়েছে। এতদিনে প্রগতির আসল অর্থ তিনি বুঝলেন। প্রেমের আসল বাঁধন যে

কোথায় তা বোঝার সুবিধা থাকলে জানা যেত, মানব পশুকে যতই মার্জিত করার চেষ্টা চলুক, প্রেমের ডাকে আদিম ক্ষুধা নিবৃত্তি না হলে কবিতার মিষ্ট ভাষণ বা সুন্দরকে গা ঘেঁষা করার জন্য যতই রুচিকে মার্জিত করা যাক না কেন, ভব্যতার প্রয়োজনে যতই মিষ্ট ভাষণ যোগান দেওয়া যাক না কেন, ওগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অভিনয়ের পর্যায়ে পড়ে। মিঃ পাকড়াশী ঘরের ভিতর এসে দেখলেন তাঁদের বিছানার উপর তাঁরই কবিতা লেখার ফুলস্কেপ কাগজে বড় বড় কাঁচা হাতের অক্ষরে লেখা রয়েছে 'আমি বাপের বাড়ি চললাম, আর ফিরব না।' খবর পড়ার পর মিঃ পাকড়াশী বেশ কিছুক্ষণ ঘরের ভিতর একলা বসে রইলেন, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় শিকল তুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। এরপর মিঃ পাকড়াশী গৃহ প্রবেশ করেছিলেন কিনা জানা যায় নি।

শেষ